গল্পে বারভুঁইয়া

শ্রীসতীশ চন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা শাস্ত্রী

এফ্, এল্, এস্, বি,এ

প্রণীত

মূল্য—৸০/বার আনা

সোনার বাংলার ভাবী উত্তরাধিকারীর হাতে

বাংলার স্বাধীনতার জন্য যাঁ'রা আজীবন চেষ্টা করে গেছেন তাঁ'দের এই বীরত্বের মঙ্গলময়ী কথা "গল্পে বার ভুঁয়া" তুলে দিলাম। আশা করি, সার্থক করে তুলবে।

আশ্বিন
১৩৪৬
পাঠন্দ—টাঙ্গাইল

শ্রীসতীশচন্দ্র শাস্ত্রী

সূচীপত্র

প্রতাপাদিত্য।

গল্পে বারভূঁইয়া

প্রথম অধ্যায়

প্রতাপাদিত্য গুহ

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আঁটে তাঁ'য়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বাহান্ন হাজার যাঁ'র ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।"

—ভারত চন্দ্র

তিনশ' সাড়ে তিনশ' বছর আগেকার কথা। তখন মোসলমান পাঠানদের আমল। শেষ পাঠান সুলতান দাউদ্ ছিলেন সম্রাট্। বঙ্গজ প্রসিদ্ধ কুলীন কায়স্থ আঁশ গুহের সন্তান শ্রীহর্ষ ছিলেন সুলতানের প্রধান কর্ম্মচারী। তাঁ'র প্রতিভার ছিল না অন্ত, দক্ষতার ছিল না শেষ।

নানাগুণে মুগ্ধ হ'য়ে সুলতান তাঁ'কে "রাজা বিক্রমাদিত্য" উপাধি দান করেন। আর তাঁ'র খুড়তুতো ভাইকে দেন "রাজা বসন্ত রায়" উপাধি।

যমুনা হ'তে সাগর-দ্বীপ অবধি সারা চব্বিশ পরগণা, যশোর ও খুলনার অর্দ্ধাংশ ছিল তাঁ'দের জায়গীর। মোগলেরা যুদ্ধ বাঁধালেন, পাঠানদের রাজ্য গেল। রাজা বিক্রমাদিত্য গৌড় ত্যাগ করে রাজধানী যশোরে এলেন, মোগল সম্রাটকে কর দিতে স্বীকার করে, করলেন রাজ্য রক্ষা। রাজা বিক্রমাদিত্য আর রাজা বসন্ত রায় দু'ভায়ে রাজত্ব করতে লাগলেন। ছিলেন পাঠানদের লোক হ'লেন মোগলদের। এমন সময় রাজা বিক্রমাদিত্যের হ'ল এক ছেলে। রাজবাড়ীতে ভারী আনন্দ কিন্তু বিধাতার লীলা বুঝা ভার। সূতিকা ঘরেই রাণী মারা গেলেন, নবজাত কুমারের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্য আর তাঁ'র ভাই রাজা বসন্ত রায় আর তাঁ'র স্ত্রীর যত্নে কুমার দিন দিন শুক্লপক্ষের চাঁদের মত বাড়্‌তে লাগলেন, যেমন তাঁ'র রূপ, তেমনই তাঁর বলিষ্ঠ দেহ। একদিন, দু'দিন করে, একমাস দু'মাস করে, একবছর, দু'বছর করে কুমার বেশ বড় হ'য়ে উঠ্‌লেন, কুমারের নাম রাখা হ'ল প্রতাপাদিত্য। উপযুক্ত শিক্ষক যত্ন করে, তাঁ'কে পড়াচ্ছেন। অসাধারণ মেধাবী সে কুমার, যা' শেখেন তা' আর ভোলেন না।

ক্রমে সংস্কৃত, বাংলা, আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষায় ওস্তাদ হ'য়ে উঠ্‌লেন। শুধু তা'ই নয় অস্ত্র শস্ত্রও বাদ গেল না। ক্ষত্রিয় কায়স্থ রাজবংশে তাঁ'র জন্ম, যুদ্ধ শিখবেন না তিনি ? তা'ও কি হয় ?

রাজার ইচ্ছা নয় যে ছেলে যুদ্ধ বিদ্যা শেখে। কিন্তু ছেলের সেই দিকেই বেশী ঝোঁক। একটা কথা আছে না, সকাল বেলাই বুঝা যায় সারা দিনটা কেমন যা'বে, এও তা'ই। কুমারের শৈশব কালেই তাঁ'র অসাধারণ অস্ত্র-নৈপুণ্য, নানাভাবে ফুটে উঠ্‌ল। সুবোধ, শান্তশিষ্ট ছেলেটী নন্ তিনি—প্রতিভা আর বিদ্যুতে বুঝি কিছু ঐক্য আছে—কেউ-ই পারে না ঠিক থাকৃতে। দুই-ই চঞ্চল দুই-ই অস্থির। পিতার সঙ্গে ছেলের আরও এক জায়গায় দেখা দিল বে-মিল। পিতা বুদ্ধিমান্—ছেলে হৃদয়বান্। এ অনৈক্য যে সে অনৈক্য নয়—বিভ্রাট আর ঝগড়া বাঁধে বাঁধে অবস্থায়, সে সবের মীমাংসা করে দিতেন, বসন্ত রায় মহাশয়। আর একটা মজার কথা শোন—ঠিক এই সময়, ভারতবর্ষেরই আর একটা জায়গায় জন্মিলেন, আর এক রাজবংশে, আর এক রাজকুমার। একজন জন্মিলেন, দুর্গম অরণ্যপরিবেষ্টিত সুন্দরবনের পাশে বাংলা দেশের যশোহরে, অন্যজন জন্মিলেন রাজপুতানার দুর্গম গিরিসঙ্কট উদয়পুরে। একজনের নাম হ'ল প্রতাপাদিত্য, অন্য

জনের নাম হ'ল প্রতাপসিংহ। দু'জনেরই কীর্ত্তিতে ভারতবর্ষ উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে।

যশোরে আর রাজপুতানায় যে দুই প্রতাপ জন্মিলেন, তাঁ'দের জন্মের সময় কমনীয় রমণী কণ্ঠের হুলুধ্বনির অভ্যর্থনায় কেউ এতটুকুনও অনুমান করতে পারেন নি যে অদূর ভবিষ্যতে, একদিন, তাঁ'দের মহোজ্জ্বল মহিমায় কোটী কণ্ঠ বন্দনা-মুখর হ'য়ে উঠ্‌বে।

মোগলেরা করতেন নানা অত্যাচার, নানা উপদ্রব। কিশোর প্রতাপ সে সব শুন্‌তেন, উদ্বিগ্ন হ'তেন, অত্যাচার নিবারণের জন্য সঙ্কল্প করতেন, আর তাঁ'র বাবা রাজা বিক্রমাদিত্য, বাদশাহের বল, বাদশাহের ক্ষমতা, বাদশাহের অগণিত সৈন্য ও অর্থের কথা বলে ছেলেকে নিরস্ত ও দুর্ব্বল করে তুলতেন।

প্রতাপ সারাদিন যুদ্ধ শিখতেন, মল্লক্রীড়া, অশ্বারোহণ ও শর চালনায় ব্যাপৃত থাক্‌তেন।

একদিন হ'ল কি—কিশোর বয়সের প্রতাপ ছুঁড়লেন একটা চিলের উপর একটা তীর। চিল উড়্‌ছিল। আর তা'র ওড়া হ'ল না, প্রতাপের অমোঘ তীরের আঘাতে ছট্‌ ফট্‌ করতে করতে, ঘুরে এসে পড়্‌ল রাজা বিক্রমাদিত্যের সাম্‌নে। সবই ভগবানের লীলা! রাজার

মন বড্ড খারাপ হ'য়ে উঠ্‌ল। কি এ ছেলেটা! রাগে তিনি থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলেন।

যাচ্ছেতাই একটা কাণ্ডই হ'ত যদি সে সময় রাজা বসন্ত রায় সেখানে না আস্‌তেন। তিনি অনেক বলে কয়ে তাঁ'র দাদা বিক্রমাদিত্যের রাগ কমালেন। কুমারের আশ্চর্য্য শর-নৈপুণ্যের কথাও ফেনিয়ে বলতে ছাড়লেন না।

ঘটনার এমনই চক্র, ঠিক সেই সময়ে কুমার প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে এসে জুট্‌লেন অসাধারণ সাহসী বীর, যুবক শঙ্কর চক্রবর্ত্তী আর সূর্য্যকান্ত গুহ। ভারী মজা হ'ল। "একা রামে রক্ষা নেই দোসর লক্ষ্মণ।" এক প্রতাপের কাণ্ডেই সকলে চমৎকার বোধ করছিল, এবার আরও দু' দু'জন। সঙ্গীদের নিয়ে তিনি আরম্ভ করে দিলেন ঘোড় দৌড়, বন্দুক ছোড়াছুড়ি ও সুন্দর বনে প্রবেশ করে ভীষণ, বড় বড় যত সব বাঘ, ভালুক শিকার। ঔদ্ধত্যের আর সীমা রইল না। বাবা আর কাকা কি করেন এ দামাল ছেলে নিয়ে? দু'জনে বুদ্ধি খাটিয়ে, প্রতাপকে বিয়ে করা'লেন। কিন্তু বিয়ে করিয়ে বউ ঘরে আনলে হ'বে কি? প্রতাপ ক্ষেপে উঠেছেন মোগল-সম্রাটের শিকল ভাঙ্গতে, বিয়ের মত শিকল দিয়ে তাঁ'কে বেঁধে রাখার চেষ্টা একটা প্রহসন ছাড়া যে আর কিছুই নয়, তা' তাঁ'র বাবা আর তাঁ'র কাকা বুঝলেন না।

সেদিন প্রথম বসন্তের রাত্রি—ছিন্ন কুয়াসার ফাঁকে ফাঁকে নির্ম্মল আকাশ ফুটে বেরুচ্ছে। রাত্রি তখন প্রায় অবসন্না হ'য়ে এসেছে, দিগন্তের শ্যাম রেখায়, অরুণের আলোর ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, প্রতাপের বাবা আর কাকা দু'জনে পরামর্শ করছেন। পরামর্শ করে প্রতাপকে পাঠালেন, মোগল সম্রাটের দরবারে। ভাব্‌লেন, মোগল-সম্রাটের ঐশ্বর্য্য দেখলেই প্রতাপের দম্ভ কমে যা'বে, প্রতাপের বিরক্ত মন সুরক্ত হ'বে। রাজা বিক্রমাদিত্য সামন্তরাজা, তাঁ'র প্রতিনিধি হ'য়ে তাঁ'র ছেলে সম্রাটের দরবারে—দিল্লীতে প্রেরিত হ'লেন।

প্রতাপ ভাবলেন, তা' ভালই করছেন তাঁ'র বাবা আর তাঁ'র কাকা। সঙ্গী শঙ্কর আর সূর্য্যকান্তকে সঙ্গে করে, নানা উপহারের ডালি নিয়ে প্রতাপ নৌকায় দিল্লীতে উপস্থিত হ'লেন।

দিল্লীর সম্রাট্—মোগল কুলতিলক আকবর বাদশাহ। তাঁ'র অমাত্য ছিলেন তোড়লমল্ল। প্রতাপকে দেখে তাঁ'রা ভারী খুসী হ'লেন। দিন যায়, রাত আসে—রাত যায় দিন আসে, প্রতাপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি—বেশ বুঝ্‌লেন, সম্রাট্ আকবরের কূটনীতি। কিন্তু করবেন কি, সেই হচ্ছে কথা। যত সব বড় বড় রাজা, সবারই সঙ্গে সম্রাট্

করেছেন, করেছেন কুটুম্বিতা কা'রও আর মাথাটিও তুলবার উপায় নেই।

কুমারের মন বড্ড খারাপ হ'ল। সেদিন শ্যামবর্ষা আকাশে তা'র বিজয় অভিযান সুরু করেছে। মেঘে মেঘে ঢেকে গেছে সারা নভোমণ্ডল। নীলিমায় ভরে উঠেছে দিগ্বলয়। সজল পবন কিশলয় ছিড়ে, উড়িয়ে খেলছে। ক্ষীণা স্রোতস্বতীতে নেমেছে বর্ষার প্লাবন—উদ্দাম তা'র গতি।

সহসা তাঁ'র মনে এক বুদ্ধি খেল্‌ল। তাঁ'র বাবা সম্রাট্‌কে দেবার জন্য তাঁ'র সঙ্গে যে দু'বছরের খাজানা দিয়ে দিয়েছিলেন, তা' আর তিনি সম্রাটকে দেন নি—দিলেনও না। না দিয়ে সম্রাটকে কৌশলে জানিয়ে দিলেন যে যশোরের রাজা বিক্রমাদিত্য অর্থাৎ তাঁ'র বাবা সম্রাটের দু'বছরের খাজানা বন্ধ করেছেন। এ কিন্তু তাঁ'র ভারী অন্যায়! সম্রাট্‌ যখন খুব রেগে গেলেন তখন প্রতাপাদিত্য সম্রাটকে জানিয়ে দিলেন যে সম্রাট্‌ তাঁ'র সে খাজানা অনায়াসেই পেতে পারেন, যদি তিনি প্রতাপাদিত্যকে রাজ্যের সনদ দেন—রাজা বলে স্বীকার করেন। খাজনা ত পা'বেনই তা'ছাড়া প্রতাপাদিত্য বাঙ্গালার বিদ্রোহও দমন করে দেবেন। সম্রাটের প্রবল সহায়ও হ'বেন

প্রতাপাদিত্য রাতদিন দরবারের হাল চাল তীব্রদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন। একদিন এক মজার কাণ্ড হ'ল। দরবারে উঠ্‌ল এক সমস্যা। কেউ আর তা' পূরণ করতে পারলেন না। পূরণ করলেন কুমার প্রতাপাদিত্য। সুযোগ যখন আসে তখন এম্‌নি করেই আসে। সম্রাট্ ভারী খুসী হ'লেন। তা'র পরেই প্রতাপের এই প্রার্থনা, সঙ্গে সঙ্গে এতগুলো বাকী খাজানা অনায়াসে লাভ করে সম্রাট্ তাঁ'র উপর একেবারে যা'রপর নেই প্রীত হ'য়ে উঠ্‌লেন। যশোরের রাজ সনদ ত প্রতাপ পেলেনই তা' ছাড়া তাঁ'র সম্মানের জন্য সম্রাট্ তাঁ'র দেহরক্ষীরূপে কমল খোজার অধীনে দিলেন বহু সৈন্য।

প্রতাপের আনন্দ দেখে কে! পথে পথে সম্রাটের অধিকৃত বিভিন্ন রাজ্য—নানা দুর্গ দেখতে দেখতে এসে উপস্থিত হ'লেন যশোরে।

সম্রাটের সনন্দের বলে তিনি এখন রাজা। তাঁ'র বাবা সব শুনলেন। মনে মনে বড্ড অসন্তুষ্ট হ'য়ে বিদ্রোহী ছেলেকে সায়েস্তা করতে সচেষ্ট হ'লেন। প্রতাপের কাকা রাজা বসন্ত রায়ের কাণে একথা গেল। তিনি তাঁ'র দাদাকে বুঝিয়ে, ফুলের মালা নিয়ে প্রতাপের শিবিরে গেলেন। প্রতাপকে সাদরে ও সস্নেহে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। প্রতাপের বাবার তখন অনেক বয়স

প্রায় সব[illegible]যের ভার তিনি ছেড়ে দিলেন তাঁ'র ছেলের উপর। পিতায় পুত্রে মিলন হ'ল।

প্রতাপ রাজ কার্য্যে মন দিলেন। তিনি অনুসন্ধান করে দেখলেন তাঁ'র রাজ্যে অন্য কোন অশান্তি তেমন কিছু নেই, মস্ত বড় অশান্তিই সৃষ্টি করছে যত সব, আরাকানের মগেরা আর পর্ত্তুগালের ফিরিঙ্গীরা। তা'রা জল পথে আসছে আর বরিশাল, খুলনা, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি তাঁ'র রাজ্যে লুট্পাট্ করছে। আগুণ লাগিয়ে দিচ্ছে, গ্রামকে গ্রাম পুড়ে ছারখার করে দিচ্ছে, স্ত্রীলোকদের উপর পিশাচের মত অত্যাচার আরম্ভ করে দিয়েছে। তা'দের দমন না করলেই নয়। কিন্তু তা'রাও ত কম দুষ্টু নয়। প্রতাপ ভেবে চিন্তে কয়েকটা ভাল ভাল দুর্গ তৈয়ারী করা'লেন, কতকগুলো জাহাজ গড়া'লেন, গোলা বারুদ তৈয়ারী করা'লেন। তা'রপর সুশিক্ষিত সব সৈন্যগণকে নিয়ে এই সব দুর্গ হ'তে, জাহাজ হ'তে গোলাবর্ষণ করে হাজার হাজার ডাকাতকে পুড়িয়ে মারলেন, দূরে যা'রা ছিল তা'রাও ভয়ে পালিয়ে গেল। আপদ চুকে গেল। দেশের লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচ্ল।

আকাশ সেদিন ঘোর মেঘলা, কুলায়ে কুলায়ে পাখীরা স্তব্ধ। বর্ষণকাতর বনযূঁথিকার ছিন্নদলের নেই কোন সুষমা, নেই কোন সৌরভ—আনন্দ বিহীন বহির্জগৎ—শুধু বহি-

জগৎ কেন বুঝি রাজা প্রতাপাদিত্যের অন্তর্জগতও আলোড়িত হ'চ্ছিল নানা ভাবের সঙ্ঘর্ষে। স্বাধীনতা ঘোষণা করলে, যে যুদ্ধ বাঁধবে তা'র ফল কি হ'বে কে জানে ?— কিন্তু আশা। দরিদ্রের আশার ন্যায়ই কি তাঁ'র বুকের ভিতর উঠ্‌বে আর লীন হ'য়ে যা'বে ? না—না তা' হ'তে পারে না—প্রতাপাদিত্য পড়েছিলেন ঋষিদের সেই উদাত্ত গাঁথা—

"উত্থানেনামৃতং লব্ধমুত্থানেন সুরাহতাঃ
উত্থানেন মহেন্দ্রেন শ্রেষ্ঠং প্রাপ্তং দিবীহচ।"

উদ্যমের দ্বারাই দেবতারা অমৃত লাভ করেছিলেন, তাঁ'দের উদ্যমেই অসুরেরা পরাজিত হয়েছিল, ইন্দ্র বড় হয়েছিলেন, স্বর্গরাজ্য লাভ হয়েছিল।

স্বাধীনতা ?—সে ধনত কোন জাতি কোনও দিন দান স্বরূপে পায়নি। নিজের উদ্যমে, নিজের চেষ্টায়, নিজের ত্যাগ স্বীকারে, নিজের পরিশ্রমে, পৌরুষের পুরস্কাররূপে তা'কে যে অর্জ্জন করতে হয়।

এমন সব আয়োজন, এমন সব উদ্যোগ করতে হ'বে, যা'তে পরাজয়ের আশঙ্কা না থাকে—তিনি যশোরের নিকটে ধূমঘাটে গড়া'লেন এক দুর্ভেদ্য দুর্গ।

দুর্গ গড়া হচ্ছে, একদিন এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল। বনে জ্বলে উঠ্‌ল দাউ দাউ করে আগুনের শিখা।

সকলে দেখে বিস্মিত হ'লেন। রাজার নিকট সংবাদ গেল। তিনি অনুসন্ধান করে দেখলেন, অগ্নি-নির্গমনস্থলে দাঁড়িয়ে করালবদনা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তি। রাজা প্রতাপাদিত্যের মন আনন্দে নেচে উঠ্‌ল। যশোরেশ্বরীর মূর্ত্তি দেখে, ভক্তি গদগদ কণ্ঠে তিনি তাঁ'র স্তব করতে লাগলেন। মনে মনে ভাবলেন মা প্রসন্না হয়ে নিজে দেখা দিয়েছেন, তাঁ'র চির আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ নিশ্চিত। মায়ের দয়া হ'লে কি না হয়? দেশময় এ শুভসংবাদ নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ল। উৎসাহ ও উদ্দীপনার সীমা রইল না।

বৃদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য ঠিক এই সময়ে দেহত্যাগ করলেন।

রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতৃশ্রাদ্ধ। বাঙ্গালার রাজন্যবর্গ ও পণ্ডিতমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হ'লেন। রাজা প্রতাপাদিত্যের নিমন্ত্রণে দেশের প্রায় অধিকাংশ হিন্দুরাজা ও মোসলমান নবাব এসে উপস্থিত হ'লেন। সকলকেই বিশেষ আদর আপ্যায়িত করে সন্তুষ্ট করা হ'ল। চতুর রাজা কথা প্রসঙ্গে সকলেরই মনের ভাব জান্‌তে চেষ্টা করলেন। সম্রাট্ আকবরের উপর কা'র কেমন প্রীতি, কা'র কেমন ভীতি তা'ও তিনি জেনে নিলেন। সকলেই শুধু ভয়ে জড় সড় হয়ে আছেন কিন্তু স্বাধীনতা সকলেরই কাম্য। কেউ

যদি সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, সকলেই গোপনে বা প্রকাশ্যে তাঁ'র সহায়তা করবেন এই আশ্বাস ও এই ধারণা প্রতাপাদিত্যের মনে বদ্ধমূল হ'ল। আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে রাজা প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হ'লেন।

আপদ ও সঙ্কটের জায়গায়ই গড়া'লেন ভাল ভাল দুর্গ। জলপথে যুদ্ধ ও গতিরোধের নিমিত্ত গড়া'লেন ভাল যুদ্ধের জাহাজ, বজরা আর পানসী নৌকা। বহুদূর থেকে যেখানে যা' ভাল তা'ই যোগাড় করে, লোহা, পাথর আনিয়ে হাজার হাজার কামান আর বন্দুক, গোলা, গুলি, বারুদের যোগাড় হ'ল। বাকী রইল সৈন্য। তা'ই বা বাকী থাক্‌বে কেন? উচ্চ নীচ নানা জাতি থেকে বাছা বাছা যোয়ান নিয়ে, সাহসী লোকদের ধরে, সন্তুষ্ট করে তাঁ'র সৈন্যদল গড়ে উঠ্‌ল, যা'রা এতদিন ছিল জলের দস্যু, ঘোর শত্রু, তা'রা হ'ল রাজা প্রতাপাদিত্যের চেষ্টায় ও সদ্ব্যবহারে তাঁ'র পর্ত্তুগীজ ও মগ সৈন্য। অসভ্য অথচ দুর্দ্ধর্ষ কুকীরাও দলে দলে এসে তাঁ'র সৈন্যদলে ভর্ত্তি হ'ল। নায়ক হ'লেন বীর শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত।

রাজা প্রতাপাদিত্যের কাকা রাজা বসন্ত রায়ের ছেলে কচু রায়, যাঁ'র ভাল নাম ছিল রাঘব, তাঁ'কে কয়েকজন কুচক্রী লোক, রাজা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে শত্রুতা বাড়া'বার

জন্য ষড়যন্ত্র করে নিয়ে রেখে এল হিজলীর নবাব ঈশাখাঁর কাছে। জ্ঞাতিবিরোধ যদি উপস্থিত হয়, তা'হ'লে ঘর সামলাতে অত্যন্ত বেগ পেতে হ'বে ভেবে রাজা প্রতাপাদিত্য সর্ব্বাগ্রে নবাবকে এই দুষ্কর্ম্মের সহায়তার জন্য শাস্তি দিতে যুদ্ধের আয়োজন করলেন। অস্ত্র শস্ত্রে যুদ্ধের জাহাজ সব ভরে, মা যশোরেশ্বরীকে খুব ঘটা করে পূজা দিয়ে, সঙ্গে সেনাপতি শঙ্কর, সেনাপতি সূর্য্যকান্ত, সেনাপতি রডা, মদন, রঘু প্রভৃতি বীরবৃন্দকে নিয়ে রাজা প্রতাপাদিত্য হিজলী আক্রমণ করলেন। স্থলপথেও অসংখ্য সৈন্য প্রেরিত হ'ল। জলে স্থলে ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল। রাজার অবিরামবর্ষী কামানের গোলার সামনে কেউ দাঁড়া'তে পারল না। নবাব গোলার আঘাতে দেহত্যাগ করলেন। নবাব মারা গেলে তাঁ'র সেনাপতি বলবন্ত সিংহ বেশীক্ষণ পাঠান সৈন্যগণকে নিয়ে রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারলেন না। হিজলী প্রতাপাদিত্যের অধীন হ'ল। হিজলী জয় হ'ল সত্য কিন্তু রাজা তাঁ'র ভাই রাঘবকে হাত করতে পারলেন না। রূপরাম বলে একটী কুচক্রী লোক ছিল, সে রাঘবকে নিয়ে দিল্লীতে পালিয়ে গেল। বাদশাহের নিকট রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অনেক কিছু অতিরঞ্জিত করে জানা'ল।

বিজয়ী রাজা প্রতাপাদিত্য মহা উল্লাসে ও মহা

সমারোহে অনেক ধনরত্ন নিয়ে ঘরে ফিরলেও শান্তিতে থাকতে পারলেন না। বিক্রমপুরের অন্য ভূঁইয়া, রাজা চাঁদ রায় নানা কারণে রাজা প্রতাপাদিত্যের উপর খড়্গহস্ত হ'য়ে তাঁ'র সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত হ'লেন। প্রতাপাদিত্য এতে ভয় পা'বার লোক ছিলেন না। তিনি মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে, সসৈন্যে ঢাকার বিক্রমপুরের রাজধানী শ্রীপুর আক্রমণ করলেন। অল্প সময়ে বহুসৈন্য ধ্বংস হ'ল। রাজা চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের চৈতন্য হ'ল। এ যে আত্ম-কলহ! সন্ধি হ'ল। দু'রাজায় মিত্রতাও হ'ল। তাঁ'রা শেষে ঠিক করলেন যে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে তাঁ'রা যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।

রাজা প্রতাপাদিত্যের দুর্গ ধূমঘাটে স্বাধীনতা জ্ঞাপক অভিষেক হ'বে। দেশের সকল রাজাকে নিমন্ত্রণ করা হ'ল। সমবেত রাজন্যবৃন্দকে স্বাধীনতা হীনতার দুর্দ্দশার কথা রাজা প্রতাপাদিত্য বেশ করে বুঝিয়ে বল্‌লেন। সকলের সহানুভূতি চাইলেন।

সম্রাট্ আকবরের কাণে অনেক কিছু বিরুদ্ধ সংবাদ পঁহুছিল। তিনি শুনলেন রাজা প্রতাপাদিত্য হিজলী অধিকার করেছেন। অনেক সৈন্য সামন্ত যোগাড় করেছেন, নিজের নামে মুদ্রা তৈয়ারী করাচ্ছেন, রূপরাম তা'র উপর নানা কারিগরী করে যত কিছু কথার বহর রচনা

করলেন, সম্রাট্ সে সব শুনে, একেবারে রেগে বাঘ হ'লেন। প্রতাপের প্রতাপ খর্ব্ব করতে আজ্ঞা দিলেন। সংবাদ রাষ্ট্র হ'তে দেরী হ'ল না।

রাজা প্রতাপও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি তাঁ'র সহকারী, সুবক্তা শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে প্রজাগণকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। তিনি ঘূরতে ঘূরতে মোগল সম্রাটের বলাবল বুঝ্তে বুঝ্তে রাজমহলে গিয়ে উপনীত হ'লেন।

রাজমহলে রাজা প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ও প্রচারক শঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় সর্ব্বত্র সম্রাটের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের বর্ণনা করতে লাগ্লেন। সেখানে ছিলেন সম্রাট্ আকবর বাদশাহের একজন চতুর কর্ম্মচারী, তাঁ'র নাম ছিল শের খাঁ। রাজদ্রোহ-প্রচারককে তিনি নানা কৌশলে ধরে ফেললেন ও বন্দী করলেন।

এই সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রাজা প্রতাপাদিত্য বন্ধু ও সেনাপতির এইরূপ দুর্দ্দশার সংবাদে সসৈন্যে রাজমহল আক্রমণ করলেন। তাঁ'র সৈন্যগণের নিকট বাদশাহী সৈন্য জলে স্থলে সর্ব্বত্র হেরে গেল। সেনাপতি শঙ্কর চক্রবর্ত্তী নিজেই কৌশলে কারামুক্ত হয়েছিলেন, এখন রাজা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মিলে মহানন্দে যুদ্ধের আয়োজনে ব্যাপৃত হ'লেন।

কি কাণ্ড সব হ'য়ে গেল ! ঈশাখাঁকে মেরে ফেলানো হ'ল, বিক্রমপুরের রাজা চাঁদ রায়, কেদার রায়কে আক্রমণ ও সন্ধি হ'ল, শের খাঁ পরাজিত হলেন, সবই দুঃসংবাদ, একজন সামন্ত রাজার এই দুঃসাহস ও আস্পর্দ্ধা সম্রাট্ আকবর সহ্য করতে পা'রলেন না, তিনি অসংখ্য সৈন্য দিয়ে তাঁ'র বাছা সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁকে রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রতাপ খর্ব্ব ক'রতে পাঠা'লেন। সৈন্যেরা ছুটে চল্‌ল। প্রথম এল সপ্তগ্রামে, সেখানে থেকে নৌকায় গেল মাতলা দুর্গে ও তা'রপর গেল রায়গড় দুর্গে। দু'টো দুর্গই আক্রমণ ও অবরোধ ক'রলে, উভয় পক্ষে আরম্ভ হ'ল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, মোগল সৈন্যের সংখ্যা ছিল না, মরে আর নূতন সব আসে। প্রতাপাদিত্য ভেবে চিন্তে বীর কমল খোজা ও সূর্য্যকান্তকে বিরাট সৈন্যদল সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন, তাঁ'রা এল দু'দিক্ থেকে, আক্রমণ করল অতর্কিত ভাবে, মোগল সৈন্যের পেছন দিকে।

সামনে সব গোলন্দাজ সৈন্য দুর্গ থেকে ছাড়ছে অনর্গল কামান, আগুনে পুড়ে মরছে যত মোগল সৈন্য, আবার পেছনে সুদক্ষ সেনাপতি কমল খোজা ও সূর্য্য-কান্তের নতুন সৈন্যের অজস্র, অনর্গল গোলা বর্ষণ। কতক্ষণ আর সইবে ? মোগল সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ [illegible] অবশিষ্ট সৈন্যগণকে একত্র করে যুদ্ধ ছেড়ে

পালিয়ে গেলেন, পথে যেতে যেতে ভাবলেন মাতালা দুর্গ বুঝি অরক্ষিত, এই ভেবে তিনি সেই দুর্গ করলেন আক্রমণ। কিন্তু মাতালা দুর্গ অরক্ষিত ত ছিলই না বরং দুর্গ হ'তে যে সব গোলার বৃষ্টি হ'তে লাগল তা'তে সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ হতভম্ব হয়ে গেলেন। জলযুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন সুবিখ্যাত পর্ত্তুগীজ বীর রডা, তিনি জাহাজ থেকে গোলার আগুনে প্রলয় সৃষ্টি করে তুললেন।

স্থলে সেনাপতি সূর্য্যকান্ত, সেনাপতি শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, মদন মল্ল, সুখময়, কমল খোজা, সুন্দর প্রভৃতি মহাবীরেরা গজারোহী, অশ্বারোহী, পদাতিক প্রভৃতি সৈন্য নিয়ে রাজা প্রতাপাদিত্যের জন্য প্রাণপণ করতে লাগলেন, কি সে সাঙ্ঘাতিক যুদ্ধ! মোগল সেনাপতি হেরে গেলেন, পালিয়ে জীবন বাঁচা'লেন।

বিজয়গৌরবে রাজা প্রতাপাদিত্য স্বীয় রাজধানী যশোরে ফিরে যশোরেশ্বরীর পূজো করলেন। দু' দু'বার মোগল সম্রাট্ তাঁ'র কাছে পরাজিত হ'লেন। রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরাট বাহিনী সেজে চল্‌ল, রণভেরী বাজিয়ে গঙ্গার দু'ধার দিয়ে, বড় বড় সব রণতরী চল্‌ল জল পথে; পথে পড়ল সরস্বতীনদী-তীরের মোগলদের সাজানো সপ্তগ্রাম নগর। রাজার সৈন্যেরা তা' লুঠ্ করলেন।

তা'র পর জয় করা হ'ল রাজমহল। অনেক পাঠান

নবাব ও অনেক হিন্দু রাজা তাঁ'কে দিতে লাগলেন সৈন্য, বল, ভরসা। তখন তাঁ'র পূর্ণ উন্নতির সময়।

এইবার নবোদ্যমে রাজা প্রতাপাদিত্য আক্রমণ করলেন পাটনা। শুনে, সম্রাটের ক্রোধের আর সীমা থাক্‌ল না। আবার নিদারুণ যুদ্ধ বেঁধে উঠ্‌ল, মোগল-সেনাপতিরূপে প্রেরিত হ'লেন মহাবীর আজিম খাঁ।

রাজা প্রতাপাদিত্যের ঢাল নিয়ে যুদ্ধ করবার পদাতিক সৈন্যই ছিল বায়ান্ন হাজার, অন্য সৈন্যদের ত কথাই নেই। সেনাপতি আজিম খাঁও পরাজিত হ'লেন। রাজার উদ্যোগ আরও ঊর্দ্ধ্ব দিকে ধাবিত হ'ল।

এ সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই সম্রাট্ আকবর ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। সম্রাট্ হয়েছিলেন তাঁ'র ছেলে জাহাঙ্গীর বাদশাহ। সম্রাট্ আকবর ছিলেন প্রায় ছ'মাস অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। তা'রপর তিনি মারা গেলেন, নতুন বাদশা হ'লেন ইত্যাদি নানা গোলমালে অনেক দিন আর যুদ্ধ করতে হ'ল না—রাজা প্রতাপাদিত্য প্রায় একরকম শান্তিতেই এ সময়টা কাটিয়ে নিলেন। গৃহভেদী বিভীষণ-রূপে ছিল রূপরাম। সে রাত দিন বাদশাহের কাণে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ, নানা ভাবে তুলতে লাগল, অবশেষে এমন এক সময় এল যখন বাদশাহ সত্যি সত্যি ক্ষেপে উঠ্‌লেন। কাবুল ও চিতোর

রাজা মানসিংহকে সেনাপতি করে বাদশাহ জাহাঙ্গীর এক বিরাট সৈন্য বাহিনী পাঠা'লেন রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে।

রাজা প্রতাপাদিত্য ছিলেন বারাণসী জয়ের চেষ্টায়। এদিকে তাঁ'র রাজ্যের মধ্যে তাঁ'র বিরুদ্ধে চলছিল নানা কুটিল ষড়যন্ত্র। সময় যখন খারাপ আসে তখন এমনই হয়। ঘরাও—সরিকাণী বিরোধ দেখা দিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁ'র ছেলেকে দিয়েছিলেন রাজ্যের দশ আনা ভাগ, ছ' আনা দিয়েছিলেন, রাজা বসন্ত রায়কে। সেই দেওয়াদেওয়ীর সময়ে রাজা বসন্ত রায়ের ভাগে পড়েছিল "চাকশ্রী" নামক একটা বন্দর। "চাকশ্রী" ছিল সমুদ্রতীরে। সেখানে দুর্গ করতে পারলে বিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ সহজ হ'বে ভেবে রাজ্য প্রতাপাদিত্য তাঁ'র কাকা রাজা বসন্ত রায়কে হয় "চাকশ্রী" ছেড়ে দিয়ে তত্তুল্য জায়গা নিতে, নয় তাঁ'র সঙ্গে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু রাজা বসন্ত রায় তাঁ'র ছেলেদের উত্তেজনায় প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা প্রতাপাদিত্যের কোন প্রস্তাবেই সম্মত হ'তে পারলেন না। এতে রাজা প্রতাপাদিত্যের বড্ড রাগ হ'ল।

বহ্নি ধূমায়িত হচ্ছিল, জ্বলে উঠ্‌ল একটা অদ্ভুত ঘটনায়। রাজা বসন্ত রায়ের বাবার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ হচ্ছিল।

তিনি তাঁ'র ভাইপো রাজা প্রতাপাদিত্যকেও সেই শ্রাদ্ধে করেছিলেন নিমন্ত্রণ। রাজা প্রতাপাদিত্য নিমন্ত্রণে এলেন, বিধাতার ইচ্ছায় এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘট্‌ল।

যাই রাজা প্রতাপাদিত্য শ্রাদ্ধের জায়গায় উপস্থিত হয়েছেন অমনই রাজা বসন্ত রায় তাঁ'র কোশার গঙ্গাজল ফুরিয়ে যাওয়ায় তাঁ'র ছেলেকে ডেকে বল্‌লেন—"গঙ্গাজল আন্‌ শীগ্‌গির" কথাটা কিছুই নয়—কিন্তু অনেক কিছু হ'য়ে দাঁড়া'ল ভুলে।

"গঙ্গাজল" ছিল রাজা বসন্ত রায়ের তরবারিরও নাম। রাজা প্রতাপাদিত্য কোশার গঙ্গা জলের কথা ভাবলেন না, ভুলে ভাবলেন যে তাঁ'র কাকা তাঁ'কে কেটে ফেলতে আনতে বলছেন তাঁ'র তরবারি। এত আস্পর্দ্ধা! তাঁ'কে নিমন্ত্রণ করে এনে তাঁ'র শিরশ্ছেদ করতে ছেলেকে বলছেন তরবারি আন্‌তে! রাজা প্রতাপাদিত্য ক্রোধে হিতাহিতবোধশূন্য হ'লেন। নিজের তরবারির আঘাতে এত প্রিয় কাকার মাথা কেটে ফেললেন। শ্রাদ্ধ স্থলে রক্ত-গঙ্গা বইল।

রাজা বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে অগ্রসর হ'লেন, তাঁ'রও দশা তাঁ'র পিতার মতই হ'ল। ক্রমে বসন্ত রায়ের অপর ছেলে জগদানন্দ, পরমানন্দ, রূপরাম, মধুসূদন, মাণিক্য প্রভৃতি সবাই রাজা

প্রতাপাদিত্যের হাতে শেষ হ'লেন। কিসে কি হ'য়ে গেল! রাজা বসন্ত রায়ের স্ত্রীই—রাজা প্রতাপাদিত্যকে সূতিকা ঘর থেকে মানুষ করেছিলেন, কিন্তু ক্রোধের সময় সে কথা রাজার আর মনে পড়ল না, তাঁ'র কাকীমাও বুঝ্লেন, এ সময়ে অনুনয়, বিনয় বৃথা। তিনি বহু কষ্টে সকলের ছোট ছেলে রাঘবকে লুকিয়ে রাখলেন এক কচুবনে, সেই হ'তে তাঁ'র নাম হ'ল—কচু রায়। এঁকেই বসন্ত রায়ের কর্ম্মচারী, হিজলীর জমিদার ঈশাখাঁর নিকট লুকিয়ে রেখেছিলেন। প্রতাপাদিত্য সেই ঈশা খাঁকে বধ করলে রূপরাম রাঘবকে নিয়ে দিল্লীতে সম্রাটের আশ্রয় নেয়। এ' ত আগেই বলেছি। গৃহ-শত্রুই যদি না থাক্‌ত তা'হ'লে রাজা প্রতাপাদিত্যের চেষ্টায় হয়ত বাংলা দেশের রূপ অন্য রকমের হ'য়ে যেত।

এক শত্রুদের কথা বললেম। আর এক শত্রুর কথা বল্‌ছি। তিনি হচ্ছেন চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়, শত্রুতার কারণ ভারী চমৎকার!

এই শত্রু রাজা রামচন্দ্র রায় ছিলেন রাজা প্রতাপাদিত্যের জামাতা। শ্বশুরের সঙ্গে জামাইর শত্রুতা, সেও কি সম্ভব?—কিন্তু তা'ও ঘটে, সংসারে বিচিত্র কিছুই নেই।

রাজা প্রতাপাদিত্যের মেয়ের সঙ্গে হচ্ছিল রাজা রাম-

চন্দ্রের বিয়ে। রাত্রে বাসর ঘরে একজন পুরুষ মানুষকে সাজিয়ে এনেছিলেন জামাতা রামচন্দ্র রায়, মেয়ে লোকের পোষাক পরিয়ে, সে মেয়েদের সঙ্গে করছিল হাসি ঠাট্টা, এ সংবাদ রাজা প্রতাপাদিত্যের কাণে গেল। তিনি হুকুম দিলেন, তাঁ'র জামাইকে কেটে ফেলতে, কিন্তু সে কি হয়? রাজা প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও রাজা বসন্ত রায়ের কৌশলে, কোনক্রমে স্ত্রীবেশ ধারণ করে, রাজা রামচন্দ্র পালিয়ে বাঁচলেন।

জামাই মানুষ—শ্বশুরের এ অপমানজনক ব্যবহারে হাড়ে হাড়ে চটে গেলেন। এমন শ্বশুরের মেয়েকে আর ঘরে নেবেন না এই হ'ল তাঁ'র জেদ্। অপরাধ করলেন বাবা, ফল ভোগ করতে হ'ল যে কোন দোষে দোষী নয় সেই অতটুকুন মেয়ের!

মেয়ের কাণ্ড শোন। মেয়ে রাত দিন কাঁদতে লাগ্‌ল। বাবার কাছে বলে লাভ নেই—মায়ের প্রাণে আর সহ্য হ'ল না, তিনি লোকজন সঙ্গে দিয়ে মেয়েকে জামাই বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। জামাই মেয়েকে কিছুতেই জায়গা দিলেন না। মেয়েও নাছোড়বান্দা, স্বামীর রাজ্যের যে কোন জায়গায়, ভাঙ্গা কুড়ে ঘরে হ'লেও তিনি পড়ে থাক্‌বেন, এই হ'ল তাঁ'র প্রতিজ্ঞা। তা'ই হ'ল।

এক দিন দু'দিন করে অনেক দিন, সে সতী-লক্ষ্মী পড়ে

রইলেন জীর্ণ গৃহে, শীর্ণ দেহে। রাজা রামচন্দ্র রায়ের মা বউয়ের এ দুঃখ আর সইতে পারলেন না। তিনি ছেলেকে অনেক বলে কয়ে সেই সতী-লক্ষ্মী বউকে ঘরে তুললেন। কিন্তু শ্বশুরের প্রতি রাজা রামচন্দ্র রায়ের মনোভাবের কোনই পরিবর্ত্তন হ'ল না। তিনি সুযোগ পেলেই অপকারের চেষ্টায় রইলেন।

এই বধূর প্রথম অবতরণের স্থান আজও আছে। তা'র নাম "বউ ঠাকুরাণীর হাট"। ঘটনাটি নিয়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথ লিখেছেন নাটক। রাজা প্রতাপাদিত্যের আর এক জন শত্রু ছিলেন—ভবানন্দ মজুমদার! তাঁ'র কথা, মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর তাঁ'র "মানসিংহ" গ্রন্থে অনেক করে বলেছেন। রাজা মানসিংহ ছিলেন সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সেনাপতি, দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপাদিত্যকে কূট-নীতি ভিন্ন জয় করা অসম্ভব ভেবে রাজা মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদারকে নানা প্রলোভন দিয়ে হস্তগত করেন। প্রতাপকে পরাস্ত করে তাঁ'র রাজ্য ভবানন্দ মজুমদারকে দিবেন এই প্রলোভনে প্রতাপের সমস্ত গৃহ-ছিদ্র বের করে নেন্। ভবানন্দ মজুমদারও নানাভাবে প্রতাপের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করতে থাকেন।

দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁ'র আরাধ্যা স্বয়ং ভগবতীও তাঁ'র উপরে অবশেষে বাম হ'য়েছিলেন। সে ঘটনাও ভারী চমৎকার।

রাজা প্রতাপাদিত্য ঘুম থেকে উঠছিলেন, বাইরে চেয়ে দেখলেন, এক জন মেয়ে মানুষ ঝাড়ু দিচ্ছে, কিন্তু তাঁ'র বক্ষঃস্থল অনাবৃত। রাজার ভারী রাগ হ'ল, তিনি হঠাৎ হুকুম দিয়ে বস্‌লেন মেয়েটির স্তন কেটে ফেলতে। এতে প্রতাপাদিত্যের আরাধ্যা যশোরেশ্বরী ভগবতীর বড্ড রাগ হ'ল। সামান্য অপরাধে এত কঠোর দণ্ড! রাত্রেই দেবী প্রতাপাদিত্যের মহিষীকে স্বপ্ন দেখা'লেন, তিনি প্রতাপাদিত্যের উপর ভারী বিরূপা হয়েছেন, আর তাঁ'র রাজ্যে থাকবেন না।

অম্বরের রাজা মানসিংহ বাংলায় এলেন। চক্রান্ত করে হুগলীর কাননগো-দপ্তরের ভবানন্দ মজুমদারকে আর ভবেশ্বর রায় ও তাঁ'র কনিষ্ঠ ভাইকে প্রলোভনে হাত করলেন। সব ঠিক ঠাক্ করে রাজা প্রতাপাদিত্যের কাছে পাঠা'লেন দূত। দূতের হাত দিয়ে দিলেন অসি আর শৃঙ্খল। প্রতাপাদিত্য দূতকে বললেন :—"তুমি দূত, তোমাকে আর কি বল্‌ব বল, সেই দেশদ্রোহী, মিত্র ও স্বজাতিদ্রোহী মানসিংহ যদি আজ এখানে আস্‌ত তা'হ'লে এখানেই তা'র ঐ অসির পরীক্ষা হ'ত। আমি তোমার প্রভুর মস্তক ছেদনের জন্য ঐ অসিই নিলুম, ঐ শৃঙ্খল নিয়ে গিয়ে তুমি তোমার প্রভুর পায় পরিয়ে দিও।"

যুদ্ধ বাঁধল। সে যে সে যুদ্ধ নয়। প্রতাপাদিত্য নিজে,

তাঁ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্য ও মহাবীর সেনাপতিগণ দীর্ঘ কাল অলৌকিক যুদ্ধ করলেন ; কিন্তু সময় যখন মন্দ হয় তখন কিছুতেই কিছু হয় না।

ঘোরতর সম্মুখ যুদ্ধ হচ্ছে ; পেছন হ'তে ভবানন্দ মজুমদারের এক দল সৈন্য প্রতাপকে আক্রমণ করল, পশ্চাদ্দিক্ রক্ষা করতে চেষ্টা করবার সময় মানসিংহ পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত ভীষণ ভাবে সামনে আক্রমণ করলেন। ষড়যন্ত্র সফল হ'ল। বঙ্গের শেষবীর রাজা প্রতাপাদিত্য বন্দী হ'লেন। অন্যান্য সেনাপতিরা ও প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য অলৌকিক যুদ্ধ করে যুদ্ধস্থলে প্রাণত্যাগ করলেন।

মানসিংহ মহাবীর প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করে, লোহার খাঁচায় ভরে, বাদশাহের ইচ্ছা অনুসারে, নিয়ে চললেন দিল্লী, এমন মহাবীরকে বাদশাহ স্বচক্ষে দেখবেন এই তাঁ'র বড় সাধ।

কিন্তু বাদশাহের সাধ পূর্ণহ'ল না। পথে রাজা প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে রাজা মানসিংহ কাশীধামে উপস্থিত হ'লে, রাজা প্রতাপাদিত্য চতুঃষষ্টি যোগিনীর বাড়ীতে তাঁ'রই প্রতিষ্ঠিতা ভদ্রকালীর মূর্ত্তি দর্শন করতে চান, অনুমতি পেয়ে, তদ্গত চিত্তে ইষ্ট দেবীকে দর্শন করতে করতেই মূর্চ্ছিত হন ও ইহলীলা সংবরণ করেন। এ হচ্ছে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের কথা।

চন্দ্রদ্বীপের অনেক কুলীন কায়স্থকে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি যশোর-সমাজ স্থাপন করেছিলেন ও বহু ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত এবং সিদ্ধ পুরুষেরআশ্রয় স্থলস্বরূপ ছিলেন। এমন বীর, এমন শক্তিমান্ সাধক বাংলায় বড় জন্মেন নি। তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন বিখ্যাত তান্ত্রিক শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চাননের নিকটে, আর তাঁ'র পুরোহিত ছিলেন তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের ভাই চণ্ডীবর ঠাকুর মহাশয়। রাজা প্রতাপাদিত্যের দ্বিতীয় পুত্র মুকুটমণি, যশোর ছেড়ে বিক্রম পুরে গিয়ে বাস করেন, সেনাপতি শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর অসামান্য বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে রাজা মানসিংহ শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে মুক্তিদান করেন।

—দ্বিতীয় অধ্যায়—

—কন্দর্প নারায়ণ বসু রায়—

"জগদানন্দের নন্দন কন্দর্প, সাক্ষাৎ ছিলেন যেমন কন্দর্প,
মহাধনুর্দ্ধর আর মানী মহারথ।
ছিলেন মহাশূর অক্ষৌহিণীপতি, সব্যসাচীর সমান সমাজের পতি
যুদ্ধপ্রিয়, মহাচক্রী যেন সাক্ষাৎ মন্মথ।"

—ঘটককারিকা—

বরিশাল জেলায় চন্দ্রদ্বীপ ও বাকলা। এখানকার রাজা ছিলেন কায়স্থদের মধ্য কুলীন ও সমাজপতি দনুজমর্দ্দন রায়।

তাঁ'র ছিল এক মেয়ে, সেই মেয়ের আবার ছিল এক ছেলে, তাঁ'র নাম ছিল পরমানন্দ বসু। তিনিই তাঁ'র মাতামহের সম্পত্তি পেলেন। মাতামহের সম্পত্তি পেয়ে পরমানন্দ বসু, "রায়" উপাধি লাভ করলেন। কালে রাজা পরমানন্দ বসু রায়ের পুত্র হ'ল, তাঁ'র নাম হ'ল জগদানন্দ। বিধাতার ইচ্ছায় তিনি তাঁ'র বাড়ীর সামনের নদীর জলে ডুবে মারা গেলেন। সকলেরই মনে বড় আক্ষেপ হ'ল। রাজা মারা গেলে সিংহাসন শূন্য থাকতে

পারে না। তাঁ'র ছেলে কন্দর্পনারায়ণ বসু রায় হ'লেন রাজা। এই কন্দর্পনারায়ণের ক্ষমতার অন্ত ছিল না। নদীর জলে পিতার আকস্মিক্ মৃত্যুর দুঃখে তিনি তাঁ'র রাজধানী নদী-তীর হ'তে কচুয়াতে তুলে নেন। সেখান হ'তে মাধবপাশায় যান।

রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় মহাবীর ছিলেন, তাঁ'র অসীম বীরত্বে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের মহিমা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কিন্তু তিনি "বারভূঁইয়া"দের যা' শ্রেষ্ঠ গৌরব অর্থাৎ মোগলমান সম্রাটের অধীনতা অস্বীকারের যে প্রচেষ্টা তা'তে সারাজীবন স্থির থাকতে পারেন নি।

রাজা কন্দর্পনারায়ণ নিজে অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন। মোসলমান সেনাপতি মহাবীর গাজিকে যুদ্ধে নিহত করেছিলেন। মগদের সঙ্গে তাঁ'র অনেক যুদ্ধ হয়, সব যুদ্ধেই তিনি জয় লাভ করেন। এক অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল তাঁ'র সৈন্য বিভাগে। ঘটককারিকাকার লিখেছেন, তিনি দেখতে অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন, যেমন নাম ছিল, তেমনই ছিল তাঁ'র রূপ। বাসরিকাটি, ক্ষুদ্রকাটি ও মাধবপাশা বলে তিনি তিনটি রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। হোসেনপুর নামক নগর হ'তে মোসলমানগণকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানেও একটি সহর গড়ে তাঁ'র অসীম ক্ষমতার নিদর্শন রেখে গেছেন। তাঁ'র রাজধানী মাধবপাশায় এখনও পিতলের

কামান রয়েছে, সে গুলো দেখ্‌লে তাঁ'র বীরত্ব কাহিনী স্মরণ করে আনন্দ হয়। ঘটককারিকার শ্লোকরাশি পড়লে এখনও হর্ষে উৎফুল্ল হ'তে হয়।

তিনি রাজা ছিলেন, রাজার মতই ছিল তাঁ'র ব্যবহার, আশ্রয় দান করতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি অনেকবার যুদ্ধে বিব্রত হয়েছিলেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, যখন মাসুম কাবুলীর সঙ্গে মোগল সেনাপতি সাহাবাজ খাঁর যুদ্ধ হয় তখন রাজা কন্দর্পনারায়ণ সাহাবাজ খাঁকে তাঁ'র প্রার্থনানুযায়ী যাবতীয় অস্ত্র, শস্ত্র, সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ দান করে যথেষ্ট সাহায্য করেন, শুধু তা'ই বল্‌লে অন্যায় বলা হ'বে, হোসেনপুরে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে রাজা কন্দর্পনারায়ণ পাঠানগণকে এমন ভাবে পরাস্ত করেন যে তেমন পরাজয় বুঝি তাঁ'দের আর কেউ কখনও করতে পারেনি।

সপ্তগ্রামের পাঠান বীর মীরজা মজাদ খাঁ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মোগল বাদশাহের পক্ষ গ্রহণ করলে উড়িষ্যার পাঠান নবাব কতুল খাঁ তাঁ'কে সমুচিত শিক্ষা দিতে চেষ্টিত হন। সে আক্রমণ যে সে আক্রমণ ছিল না, ভীত মীরজা মজাদ খাঁ পালিয়ে দক্ষিণ বঙ্গের সেলিমাবাদে চলে যান। নবাব কতুল খাঁ সেখানেও তাঁ'র পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন। অনুপায় হ'য়ে মীরজা মজাদ খাঁ তখন মহাবীর রাজা কন্দর্পনারায়ণের শরণাপন্ন হন। রাজা কন্দর্পনারায়ণ

নিজের বন্ধুস্থানীয় নবাব কতুল খাঁর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও মীরজা মজাদ খাঁকে আশ্রয় দান করে রক্ষা করেন। নবাব কতুল খাঁ রাজা কন্দর্পনারায়ণের প্রভাব ও বীরত্ব এবং সৈন্যবল জ্ঞাত ছিলেন, কোনক্রমেই তাঁ'র বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'তে সাহসী হন্ নি।

রাজা গণেশ পাণ্ডুয়ার রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্র যদু নামক একজন নবদীক্ষিত মোসলমান রাজা গণেশের মৃত্যুর পর পাণ্ডুয়া ও সপ্তগ্রামে অত্যাচার করতে উদ্যত হয়, তা'র ভাব দেখে শুনে, স্বধর্ম্মপরায়ণ রাজা কন্দর্পনারায়ণ সে যা'তে হিন্দুদের উপর অত্যাচার না করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে অনেকদিন পাণ্ডুয়ায় থাকেন। তাঁ'র ভয়ে যদু সেখানে কিছুই করতে সাহসী হয় না, রাজা কন্দর্পনারায়ণ সেখানে টাকশাল করে, রূপোর টাকা তৈয়ারী করা'তেন, এখনও তা'র নিদর্শন পাওয়া যায়।

আগেই বলেছি, তিনি স্থিরভাবে আগা গোড়া বার ভুঁইয়ার যা'যা' ধর্ম্ম তা'তা' পালন করতে পারেন নি; সে জন্য অনুতাপও ভোগ করেছিলেন বিস্তর। অনুতাপ-দগ্ধহৃদয়ে তিনি বহুদিনাবধি ভীমবিক্রমে মোগল-সৈন্যের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত করেন। দীর্ঘকাল সে সব যুদ্ধ হয়। মোগল সৈন্য পরাজিত হয়। মোগলদের সপ্তগ্রামের সুরক্ষিত, অভ্যুন্নত, সুরম্য, দুর্ভেদ্য দুর্গ রাজা কন্দর্পনারায়ণ

স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণের নামাঙ্কিত মুদ্রা মাটির নীচ থেকে মাঝে মাঝে বের হয়ে এখনও সে কীর্ত্তি ঘোষণা করছে।

—তৃতীয় অধ্যায়—

—রাজা চাঁদ রায় ও কেদার রায়—

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং
করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ ॥"
নিয়ত হস্তীর মুণ্ড করে বিদারণ।
বায়ু অপেক্ষা বেশী বেগ করয়ে ধারণ ॥
পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গে করে অবস্থান।
তথাপি সে সিংহ পশু ভিন্ন নহে আন ॥
ভেবে দেখ এ শৃঙ্খল কা'র পায় সাজে।
তরবারি লইলাম লাগাইব কাজে ॥

যাঁ'র ছিন্ন মস্তক ভূপতিত হ'য়েও গদ্গদ ভাষায় বলেছিল "ছিন্নমস্তে নমস্তে," সেই বাঙ্গালীর পরম ভক্ত, শক্তিসাধক মহাবীর, বার ভূঁইয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূঁইয়া কেদার রায়ের পুণ্য নাম স্মরণ ও অক্ষয় কীর্ত্তিরাশি কীর্ত্তন করবার প্রারম্ভে তাঁ'কে একান্ত ভক্তিসহকারে প্রণাম করছি। ধন্য বঙ্গদেশ যে এমন সন্তান, এমন ভৌমিক তাঁ'র কোলে খেলে বেড়িয়েছিলেন। তাঁ'র মত বীরই সগর্ব্বে বলতে পারে আমেরের (অম্বর) রাজা মানসিংহকে, "সিংহ পশুর রাজা হ'লেও পশু ছাড়া আর কিছুই নয়; ভাঙ্গুক্ সে বড় বড় হাতীর মাথা, হো'ক্ তা'র পবনের চেয়েও বেশী গতি, বাস করুক্ না সে বড় বড় পাহাড়ের সকলের উপরকার চূড়ায়।"

রাজা মানসিংহের অহঙ্কার পূর্ণ, আত্মশ্লাঘা পূর্ণ ঃ—

"ত্রিপুর মগ বাঙ্গালী, কাক কুলি চাকালি
সকল পুরুষমেতৎ ভাগি যাও পালায়ী
হয়-গজ-নর-নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি,
বিষম সমর সিংহো মানসিংহশ্চায়াতি।"

উক্তির উত্তর "তথাপি পশু ভিন্ন সে আর কিছুই নয়" এক মহাবীর, কায়স্থ-কুল-ভূষণ কেদার রায়েরই দেওয়া সম্ভবপর। কে আর এমন মুখে মুখে উত্তর দিতে পারে বল?

মোগল সম্রাট্ আকবরের রাজত্বেরও প্রায় দেড়শ’বছর আগে কর্ণাট হ’তে নিমু বলে একজন উন্নতিপ্রয়াসী ঘৃতকৌশিক গোত্রীয়, দেব উপাধিধারী কায়স্থ বাংলা দেশে আগমন করেন। তখন সেন বংশীয় রাজারা বাংলার রাজা। অনেক পরিশ্রম ও বহু আশা করে তিনি এসেছিলেন বাংলা দেশে চাকরী করবেন বলে। চাকরী তাঁ’র যুটে গেল। নিমু দেব মশাই সেনরাজাদের দপ্তরে মুহুরিগিরি চাকরী পেলেন।

কিন্তু মুহুরিগিরি করে জীবন কাটা’বার লোক ত তিনি ছিলেন না। আশার—উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাঁ’র ছিল না অবধি। সাধু যাঁ’র ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁ’র সহায়। ভগবান্ নিজেও ইচ্ছাময়। ক’রও আকুল আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেন না তিনি।

সুযোগ এসে ধরা দিল নিমু দেব মশাইর সামনে অপূর্ব্ব রূপ নিয়ে। একটা রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হ’ল। হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন রাজ্যচ্যুত হ’লেন। পাঠানেরা এলেন জোয়ারের জলের মত। সারা বাংলা প্লাবিত করে ফেললেন। বুদ্ধিমান্, একান্ত উন্নতিলিপ্সু নিমু দেব মশাই দেখলেন এই ত তাঁ’র পূর্ণ সুযোগ, আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করবার মাহেন্দ্র ক্ষণ সমুপস্থিত হ’য়েছে। তিনি মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে পাঠানের পক্ষ নিলেন।

পাঠানেরা তাঁ'র কৃতিত্বে খুসী হ'য়ে তাঁ'কে বক্‌সিস্ দিলেন বিক্রমপুর পরগণা। ভিখারী নিমু, কেরাণী নিমু—হ'লেন রাজা। বিক্রমপুরের ফুলবাড়িয়ায় বাস করতে লাগলেন। রাজা হ'য়ে হ'ল তাঁ'র উপাধি "রায়"। নির্ব্বিঘ্নে দীর্ঘ দিন চল্‌ল রাজত্ব।

এক দুই করতে করতে এল পঞ্চদশ শতাব্দী শেষ হ'য়ে। তখন পাঠানদের রাজ্যের অবসান হয়েছে, পাঠানেরা তা'দের তল্পী তল্পা গুটিয়ে ঢুকে পড়ছেন হিন্দুদের মধ্যে ; বাদশা হ'য়েছেন মোগলেরা। মোগলদের মাথায় লম্বা লম্বা তাজ, হাতে বাঁকানো তরোয়াল, ঘোড়ায় চড়ে তা'রা করছেন দেশকে শাসন। পাঠানদেরে ধরে মারে, হিন্দুদেরে মেরে বন্দী করে রাখে তা'দের কোতোয়ালীতে।

এমন সময় এই নিমু রায়ের দু'জন বংশধর একজনের নাম চাঁদ অন্য জনের নাম কেদার, রামায়ণের রাম লক্ষ্মণের মত বীরত্বে, রূপে, নানা গুণে দেশ উজ্জ্বল করে পদ্ম ফুল দু'টীর মত ফুটে উঠ্‌লেন। মোগলদের অত্যাচার, উপদ্রবের কথা শুনে বল্‌লেন, "আচ্ছা রসো, এতো অহঙ্কার! বটে!"

এ হচ্ছে তিন, চা'র শ'বছর আগেকার কথা, তখনকার বাঙ্গালী এখনকার মত ছিল না। বাঙ্গালী-শিল্পীরা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গড়ে উঠা'তেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গড়, লোহা গালিয়ে

গড়তেন মস্ত মস্ত কামান, তাঁ'দের গোলন্দাজদের গোলায় আগুনে উড়ে বিপক্ষেরা বলত, হ্যাঁ এঁরা বীর বটে।

আগেই বলেছি, রাজা চাঁদ রায় আর রাজা কেদার রায় দু'ভাই। দু'টো দেহ কিন্তু আত্মা যেন অভেদ—আত্মা যেন এক, ভাই বলতেই অজ্ঞান—দু'জনেরই একবুদ্ধি, এক কায। যেন হরি আর হর—রাম আর লক্ষ্মণ।

তাঁ'রা বাছা বাছা লোক আনা'লেন, লস্কর আনা'লেন, সিপাই এল, শান্ত্রী এল, রাস্তায় ঘাটে গজ্ গজ্ করতে লাগ্‌ল। মস্তবড় ছিল মাঠ, কোদাল দিয়ে কেটে হ'ল খাল। প্রকাণ্ড দুর্গ গড়ে উঠল সে খালের পাড়ে। পৎ পৎ করে উড়তে লাগ্‌ল নিশান, নানা দেশ থেকে এল নানা মিস্ত্রি, রাজাদের হুকুমে স্তূপাকার সব লোহা গালিয়ে গড়্‌ল হাজার হাজার কামান, বন্দুক, তরোয়াল, বর্শা, আর যত সব যুদ্ধের আয়োজন—উপকরণ, অস্ত্র শস্ত্র।

রাজ্য রক্ষার জন্য যেমন দুর্গ ও অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী হ'ল তেমনই প্রজার মঙ্গলের জন্য রাজারা দু'ভাই প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেক বড় বড় পুকুর কাটা'লেন, ভাল ভাল পথ তৈরী করা'লেন, পথের পাশে পাশে দিলেন উত্তম উত্তম গাছ লাগিয়ে, বিচার আচার এমনই সুন্দর আর নিরপেক্ষভাবে করতে লাগলেন যে সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল। চোর, ডাকাত আর উপদ্রব করে না, রাতে

দোর খুলে শুয়ে থাকলেও কেউ ঘরে ঢুকে চুরি করতে সাহস পায় না—পাকা পাহারার বন্দোবস্ত, কড়া আইন। রাজধানী হ'ল "শ্রীপুরে"। "শ্রীপুর" হচ্ছে, বিক্রমপুরে বর্ত্তমান তারপাশা ষ্টেশনের কাছে—পদ্মানদীর তীরে।

রাজারা সব বন্দোবস্তই ভাল করে উঠা'লেন, কিন্তু, মস্তবড় দু'টো ফ্যাসাদ ছিল, সে ফ্যাসাদ দু'টো কেউ-ই দূর করতে পারেন নি। দেশের লোক ছিল সায়েস্তা, দেশের লোকের চরিত্রও ভাল ছিল সত্য কিন্তু বিদেশ পর্ত্তুগাল থেকে একদল লোক এসে ভারী জ্বালাতন করতে সুরু করেছিল, আর আরাকানের একদল লোক, নাম তা'দের মগ, তা'রা এসে বেজায় গোল বাধিয়ে দিয়েছিল; এই মগদের রাজা ছিল আরাকানের রাজা মেংরাজগী সেলিম সা। পর্ত্তুগাল থেকে পর্ত্তুগীজেরা এসে বাংলায় বাণিজ্য করত, তা'রা গোয়া, কোচিন, মলাক্কা, সিংহল প্রভৃতি স্থানে বাস করত, আর ব্যবসায় বাণিজ্য করে দেশে চলে যেত, অবশ্য সবাই যে খারাপ লোক ছিল তা' নয় কিন্তু তা'দের মধ্যে কতকগুলো লোক এত বেশী খারাপ ছিল যে তা'রা তা'দের নিজেদের সমাজে পর্য্যন্ত স্থান পেত না। তা'রা আরাকানের লোকদের সঙ্গে ভাব করে, আরাকানেই করলে প্রধান আড্ডা, এদিকে আরাকানের রাজারও ছিল মহা মুস্কিল, মোগলেরা তাঁ'কে

করত ভারী জ্বালাতন, কি করেন তিনি ? অগত্যা জল-দস্যু পর্ত্তুগীজদেরেই নিজ রাজ্যে স্থান দিয়ে খানিকটা প্রতিকার হ'বে ভেবে—নিশ্চিন্ত রইলেন। তা'রা শুধু সেখানে বদ্ধ না থেকে সমুদ্রের তীরে, চাটগাঁয়ের বন্দরের আশ্রয় নিলে। এদের মত নিষ্ঠুর, দয়ামায়াহীন ডাকাতের কথা বড় শোনা যায় না। নৌকোয় চড়ে, জাহাজে চড়ে, নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে, রাত দিন চুরি ডাকাতি করত, গ্রামে গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিয়ে, পুড়ি যে সর্ব্বনাশ করে, অসহায় গ্রামবাসীদের সব কিছু লুট পাট করে যাচ্ছে তা'ই করত। বঙ্গোপসাগরে, মেঘনায়, গঙ্গায় যা'রা নৌকো নিয়ে যাতায়াত করত, ব্যবসায় বাণিজ্য করত, তা'রা বিপদের আশঙ্কায় সর্ব্বদা অস্থির হ'য়ে উঠেছিল। স্বয়ং মোগল সম্রাটও কিছু করতে পারেন নি। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ভূষণার রাজা মুকুন্দরাম রায়, খিজিরপুরের নবাব ঈশা খাঁও এদের দমন করতে পারেন নি, কৌশলে দমন করেছিলেন এই চাঁদ রায় আর কেদার রায়—পর্ত্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তা'দের বার বার পরাস্ত করেও যখন তা'দের দমন করা সম্ভব হ'ল না, তখন তাঁ'রা বুদ্ধি খাটিয়ে পর্ত্তুগীজদের সঙ্গে করলেন সদ্ভাব। তা'রা তাঁ'দের বশ হ'ল। কাঁটা দিয়ে যেমন কাঁটা তোলে তেমনি করে তাঁ'রা পর্ত্তুগীজদের দিয়ে মগদের করলেন

দমন, পর্ত্তুগীজেরাও ক্রমে শায়েস্তা হ'য়ে এল। ততটা বাড়াবাড়ি আর রইল না, শেষে এমন হ'ল যে তা'রা চুরি, ডাকাতি ছেড়ে রাজাদের সম্পূর্ণ বশ হ'য়ে পড়ল। এতে তাঁ'দের রাজ্যে বেশ একটা শান্তির ছায়া দেখা দিল।

তা'র পর কি হ'ল শোন। একদিন রাজা কেদার রায় তাঁ'র দাদা চাঁদ রায়কে বললেন—"দাদা! সব ত হ'ল—কিন্তু আমরা কি এমনই অধীন হ'য়ে চির কালটা দুঃখু ভোগই করব? শুয়ে, খেয়ে, বসে পাচ্ছিনা এতটুকুনও শান্তি, যা'রা পরের অধীন, তা'দের আবার সুখ কোথায়?" আপনি ত জানেন :—

"সর্ব্বং আত্মবশং সুখম্,
সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্॥"

চাঁদ রায়, ভাইয়ের কথা শুনে, বল্‌লেন, "তা'হ'লে তোমার যা' ভাল লাগে কর।"

দু'ভাইয়ের মন্ত্রণা হ'ল। বাইরে এসে তাঁ'রা হুকুম দিলেন, সব রাজাকে নিমন্ত্রণ করে আনতে! রাজাদের আদেশে ছুটে চল্‌ল দূতেরা, কেউ চলল ঘোড়ায়, কেউ চল্‌ল ছিপে চেপে, কেউ ছুট্‌ল হেঁটে।

রাজধানী শ্রীপুরের চার দিকে ছিল মাঠ, শস্যের ক্ষেত, সেই বিরাট, বিপুল মাঠে, শস্যের ক্ষেতগুলো সমান করে, খাটানো হ'ল তাঁবু, তাঁবুর উপরে পৎ পৎ করে উড়তে

রাজা কেদার রায়ের কোটীরশ্বরের মন্দির।

লাগ্‌ল সব নানা রঙ্গের নিশান। প্রকাণ্ড সভা-মণ্ডপ গড়ে উঠ্‌ল।

বড় বড় সোনারূপোর কাযকরা সিংহাসন পাতা হ'ল। বাংলার সব রাজারা এসে সভা আলো করে বস্‌লেন।

কথা উঠল, সকলে একবাক্যে নিজেদের ত্রুটী—সঙ্ঘবদ্ধ না হওয়ার কথা স্বীকার করলেন। সকলেই বললেন, "আসুন আমরা এক হই, বুঝিনি এত দিন, তা'ই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে ছিলেম"। সকলে মিলে স্বাধীনতার জন্য চেষ্টিত হ'লেন। দেশের অবস্থা আশাজনক হ'য়ে উঠ্‌ল। রাজা চাঁদ, রাজা কেদারের মুখে নিশ্চিন্ততার হাসি দেখা দিল।

সব হ'ল—হ'তে চল্‌ল কিন্তু একটা জিনিষ এতক্ষণ বলা হয়নি—সেইটেই ছিল এ রাজাদের মস্তবড় মনোকষ্টের কারণ, তাঁ'দের ছিল না ছেলে পিলে, তাঁ'রা ছিলেন নিঃসন্তান।

ভাবতে ভাবতে রাজা চাঁদ রায় একদিন রাত্রে ঘুমোলেন। ঘুমোতে ঘুমোতে স্বপ্ন দেখলেন, কোন্ এক দেবতা তাঁ'কে বলছেন! "রাজা, তুমি যদি [illegible] মন্দিরের পূজারী দেবল ব্রাহ্মণকে তোমার গুরু কর, তবেই দেখতে পা'বে সন্তানের মুখ"। শ্রীমন্ত খাঁ ছিলেন তাঁদের গুরু। তাঁ'কে ছেড়ে নূতন গুরু করতে হ'বে—কিন্তু ঠাকুর যে অভিশাপ করবেন।

দাদার কথা, রাজা কেদার রায় ফেলতে পারলেন না, রাজা কেদার রায় গিয়ে দেবল ঠাকুরকে নিয়ে এলেন কে রের মন্দির থেকে, শ্রীমন্ত ঠাকুরের বড্ড রাগ হ'ল

স্বপ্ন সত্যি হ'ল। রাজা চাঁদ রায়ের এক মেয়ে হ'ল। মেয়ের নাম হ'ল স্বর্ণময়ী। মেয়ে বড় হ'ল। চন্দ্রদ্বীপের যুবরাজের সঙ্গে হ'ল তাঁ'র বিয়ে।

কিন্তু স্বর্ণময়ী হ'লেন বিধবা। তিন দিনের জ্বরে যুবরাজ মারা গেলেন, মেয়েকে এনে রাজা আর রাণী রাখলেন নিজেদের কাছে। যুবতী মেয়ে—অত রূপ, বিধবা হ'য়ে কি করে থাকবে সেখানে, মেয়ে ত এসে রইল বাপের বাড়ী, এদিকে কি হ'ল শোন ঃ—

আগেই বলেছি, হিন্দু রাজারা সব এক হ'য়েছেন, হিন্দু ছাড়া মোসলমান ভূম্যধিকারীও যাঁ'রা একটু ক্ষমতা রাখতেন তা'রা হিন্দুদের সঙ্গে মিশ্‌লেন, একে একে বাংলায় অসীম প্রতাপশালী বার ভূঁইয়ার অভ্যুত্থান হ'ল। ভারী বুদ্ধিমান্ আর কৌশলী তাঁ'রা, প্রথমে বুদ্ধি করে দিল্লীর বাদশার কর বন্ধ না করে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগ্‌লেন। বাদশা কর পেলেই খুসী। দিল্লী অনেক দূর। বাংলায় কি হ'ত না হ'ত তত খবর নেবার দরকারও বোধ করতেন না। প্রতিনিধি রেখে দিয়েছিলেন, তিনিই বাংলার রাজাদের তত্ত্বাবধান করতেন। বাংলার রাজারাও যে যখন পারতেন

ছলে, বলে, কৌশলে জায়গা, জমি, রাজ্য দখল করে ভোগ করতেন, দিল্লীতে একটা কর দিলেই সব মিটে যেত। যিনি দিল্লীর প্রতিনিধি থাকতেন তিনি রাজ্যের ভেতরের ব্যাপারে হাত দিতে পারতেন না, দিতেনও না। এইভাবে যশোর থেকে উঠ্‌লেন, প্রতাপাদিত্য, তা' আগে বলেছি। সুবর্ণগ্রাম থেকে উঠ্‌লেন ঈশাখা, আর শ্রীপুর থেকে উঠ্‌লেন আমাদের এই চাঁদ রায় আর কেদার রায়। সকলেরই মনে একভাব—স্বাধীন হ'বেন, মোগলের অত্যাচার, অধীনতা আর সইবেন না, বার ভূঁইয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূঁইয়া ঈশা খাঁ, মোসলমান হয়েও মিশ্‌তে চাচ্ছিলেন রাজা চাঁদ রায়, কেদার রায়ের সাথে, দেখা সাক্ষাতের প্রয়োজন—যুক্তি পরামর্শ করা চাই ত।

সংবাদ দিয়ে, খুব ঘটা করে, রাজার হালে ভূঁইয়া ঈশা খাঁ চল্‌লেন শ্রীপুরে। কি করা যায় ঠিক্ করবেন, সঙ্গে তেমন লোক জন নিলেন না, গেল্ কেবল রাজার ঠাট বজায় রাখতে, যে সব লোকের দরকার তারাই।

ঈশা খাঁ শ্রীপুরে উপস্থিত হ'লে রাজারা যতদূর সম্ভব তাঁ'র অভ্যর্থনা করলেন। তিন জনে নির্জ্জনে আগুন সাক্ষী করে মিত্রতা করলেন, আমোদ উৎসবও খুব হ'ল।

দৈবের নির্বন্ধ। খণ্ডন করবে কে? ঈশা খাঁর খেয়াল

হ'ল তিনি গোপনে, ছদ্মবেশে শ্রীপুর নগর পাঁতি পাঁতি করে দেখবেন।

চাঁদ রায়, কেদার রায়ের বাড়ী—শ্রীপুর সহর—কি বিরাট্, কি চমৎকার! মহলের পর মহল, আঙ্গিনার পর আঙ্গিনা—রাস্তা, ঘাট, গাড়ী, ঘোড়া, দেখতে দেখতে ঈশা খাঁ চলেছেন।

দেখলেন ছাদের উপর এক সুন্দরী মেয়ে বসে আছেন, পরণে তাঁ'র ধব্ ধবে্ ধুতি। চুলগুলো তাঁ'র মেঘের মত, কাঁধে, পিঠে, বুকে, মুখে এলিয়ে পড়েছে, কি সুন্দর তাঁ'র মুখ পৃথিবীর সব সৌন্দর্য্য ছেনে বুঝি বিধাতা গড়েছেন তাঁ'কে, ঈশা খাঁ কেমন যেন হ'য়ে গেলেন। শুন্‌লেন তিনি আর কেউ ন'ন্ চাঁদ রায়ের ষোড়শী, বিধবা মেয়ে স্বর্ণময়ী বা সোনামণি। ঈশা খাঁ সব ছেড়ে ছুড়ে পাগলের মত তাঁ'র বাড়ী এলেন, বাড়ী ছেড়ে তাঁ'র ত্রিবেণী দুর্গে আস্তানা গাড়লেন, কা'রও সাথে নেই কথা—রাত দিন ভাব্‌ছেন।

একদিন হঠাৎ ডাকলেন—"কোন্ হ্যায়?" এনায়েৎ খাঁ প্রহরী এসে, কুর্নিস্ করে বল্‌ল, "হুজুর!" ঈশা খাঁ তাঁ'র হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বল্‌লেন;—"এই চিঠি নিয়ে—এক্ষুণি ছুটে যাও শ্রীপুরে, যে কদমে যা'বে, সেই কদমে আসবে কিন্তু। রাজার উত্তর নিয়ে আসা চাই, বুঝ্‌লে, খুব হুঁসিয়ার।"

এনায়েৎ খাঁ মস্ত ঘোড়সোয়ার। ছুটে চলে গেল শ্রীপুরে। ভেতরে খবর গেল—ঈশা খাঁর দূত এসেছে। দেখা করতে রাজা চাঁদ রায় এলেন না—এলেন রাজার ভাই, রাজা কেদার রায়।

রাজা কেদার রায় ঈশা খাঁর কৌটো খুলে, আতরে মাখা চিঠি পড়লেন। পড়ে, থর্ থর্ করে কাঁপ্‌তে লাগলেন, বল্‌লেন ঃ—"দূত! তুমি অবধ্য, কি আর বল্‌ব তোমায়? তোমার মুনিবকে বলো, এ আস্পর্দ্ধা সইব না। চিঠির উত্তর সে পাবে তরোয়ালের মুখে। এই বলে চিঠিখানাকে ডেলা পাকিয়ে ফেলে দিলেন!

রাজা কেদার রায় ক্রোধে আগুন হ'য়ে সব কথা গিয়ে দাদা'কে বল্‌লেন, ঈশা খাঁ সোনামণিকে বিয়ে করতে চায়, আমাদের বিধবা মেয়ে—আমরা হিন্দু, সে মোসলমান, জেনে-শুনেও তাঁ'র এত'আস্পর্দ্ধা! দু'ভায়ে, হাজার সৈন্য নিয়ে চললেন, স্থলপথে চল্‌ল—গোলন্দাজ, অশ্বারোহী, পদাতিক; জলপথে চল্‌ল, জাহাজে জাহাজে যত সব জল যোদ্ধারা, বাছা বাছা সব লোক, অহঙ্কার চূর্ণ করতে হ'বে লোভী ঈশা খাঁর।

দেওয়ান রঘুনন্দনের উপর রইল রাজ্যের ভার—রাজবাড়ীর ভার—রাণীদের ভার, রাজকন্যা স্বর্ণময়ীর ভার। রাজারা [illegible] প্রণাম করে রথে চড়ে ছুটে চল্‌লেন।

ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও লক্ষ্যা নদী যেখানে মিশেছে, সেই খানে ছিল ঈশা খাঁর ত্রিবেণী দুর্গ, সে দুর্গ ছিল সুদৃঢ়। তা'রই কিছু পশ্চিমে আবার লক্ষ্য ও ধলেশ্বরীর সঙ্গম স্থলে ছিল কলাগাছিয়া দুর্গ—রাজারা দু'ভা'য়ে সে দুর্গ ধূলিসাৎ করলেন, ত্রিবেণী দুর্গ দখল করতে হ'বে। রাজা কেদার রায়ের সঙ্গে চল্‌ল নৌ-সেনা। রাজা চাঁদ রায় ঈশা খাঁর রাজধানী খিজিরপুর আক্রমণ করে, তাঁ'র সমস্ত ধন-ভাণ্ডার লুঠ্‌ করলেন, ঈশা খাঁ গেলেন তাঁ'র সব চেয়ে দৃঢ় দুর্গ ত্রিবেণীতে, রাজা কেদার রায় যে সেখানেও গেলেন তা'ত আগেই বলেছি। রাজা কেদার রায় ছিলেন জল-যুদ্ধে অদ্বিতীয়। তাঁ'র জল-যুদ্ধের সৈন্যেরাও অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল। নিজেরাই ছিপ্‌ চালা'ত, বন্দুক মারৃত, অব্যর্থ তীর ছুড়্‌ত। বাঙ্গালীর সে নৌ-সেনা আর নেই—সে অসীম বীরত্বে ভরা প্রাণ, কৌশলী যোদ্ধা রাজা কেদার রায়ও নেই। রাজা কেদার রায়ের সেই দেড়'শ ছিপ, আর হাজার সৈন্য ত্রিবেণী দুর্গ ছেয়ে ফেল্‌লে।

এদিকে এক কাণ্ড হ'ল। রাজাদের গুরু, শ্রীমন্ত খাঁর কথা আগে বলেছি। তিনি তাঁ'দের ব্যবহারে ভারী রুষ্ট হয়েছিলেন, প্রতিহিংসার জন্য করছিলেন প্রতীক্ষা। এই বার তাঁ'র বহু আকাঙ্ক্ষিত পূর্ণ সুযোগ উপস্থিত হ'ল। তিনি এসে যোগ দিলেন ঈশা খাঁর সাথে।

এসে দেখ্লেন, ঈশা খাঁ মনে মনে একান্ত ভাবে চাচ্ছেন সোনামণিকে কিন্তু কোন উপায় করতে পারছেন না, বললেন ঃ—"খাঁ সাহেব, তুমি সেই সোনার বরণ কন্যা, সেই মেঘ বরণ চুল, হাসতে যা'র মুক্তো ঝরে, তা'কে চাও? যদি এনে দিতে পারি, কি দেবে বল ত?"

ঈশা খাঁ আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। বল্লেন, "যদি সত্যি পার, তুমি কেন, তোমার ছেলে, তা'র ছেলে যা'তে পায়ের উপর পা রেখে খেতে পায়, তা'র ব্যবস্থা আমি করে দেবো এখন।" ঈশা খাঁ জিজ্ঞাসা করলেন—"পারবে ঠাকুর?" শ্রীমন্ত ঠাকুর বললেন ঃ—"নিশ্চয়" —ঈশা খাঁ উঠে, এক ঘড়া সোনার মোহর এনে দিলেন আগাম, বললেন,—"আজ এই নিয়ে যাও ঠাকুর, কায শেষ করে, এই সোনার গাঁয়ে সোনামণিকে নিয়ে এস, যা' আমার মনে আছে দোব, এই নাও আমার আংটি, এর জোরে এ রাজ্যে হ'বে তোমার অবাধ গতি।" এক ঘড়া সোনার মোহর নিয়ে, আর ঈশা খাঁর আংটি নিয়ে শ্রীমন্ত ঠাকুর চললেন বাড়ীতে। গিয়ে, গোপনে গর্ত্ত খুড়ে খুড়ে, ঘড়া রেখে মাটি চাপা দিয়ে, খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে, চুল-গুলোকে উস্কো খুসকো করে, পাগলের মত হ'য়ে, শ্রীমন্ত ঠাকুর চল্লেন শ্রীপুরের পথ দিয়ে, রাস্তায় ভীড় হ'তে লাগ্ল।

কা'রও সাথে একটা কথাও না বলে শ্রীমন্ত ঠাকুর একেবারে হাজির হ'লেন রাজবাড়ীর দোরে। ঠাকুর ভেতরে ঢুকে রাণীর মহলে গিয়ে, স্বামীর মঙ্গলের জন্য পূজারতা রাণীকে বল্‌লেন, "রাণীমা! রাণীমা! সর্ব্বনাশ হয়েছে," রাণী চমকে উঠে বললেন—"সে কি ঠাকুর?"

শ্রীমন্ত ঠাকুর কান্নার ভাণ করে বললেন; "রাজারা বন্দী হয়েছেন, সৈন্য সব বিশৃঙ্খল, শত্রু-সৈন্য তা'দেরে তাড়া করেছে, শ্রীপুরের দিকেই তা'রা আস্‌ছে—আসছে কি, এল বলে।"

রাণী বললেন, "আসুক্"

শ্রীমন্ত বললেন, সে কি মা? তা'রা কি আর কিছু রাখ্‌বে? তারা' যে আসছে, সোনামণিকে নিতে! আপনি শ্রীপুর ছেড়ে চলে যান্—সোনামণিকে লুকা'বার চেষ্টা করুন্।

রাণীর চোখ দু'টো বাঘিনীর মত জ্বলে উঠ্‌ল, রাণী বললেন—"চাঁদ রাজার রাণী যা'বে পালিয়ে? তা'ও কি কখনও হয়?" যা'ত একজন দেওয়ানজীকে ডেকে নিয়ে আয়।"

দেওয়ান রঘুনন্দন এলেন, বললেনঃ—"না, না পালা'বেন কেন মা? প্রাণ দিয়ে রঘুনন্দন আপনাদেরে বাঁচাবে।"

রাণী আশ্বস্তা হ'লেন, কিন্তু শ্রীমন্তের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। শ্রীমন্ত বল্‌লেন ঃ—"দেওয়ানজী, এ বুদ্ধি ভাল হচ্ছে না, কি সে কি হয় কে জানে, সাবধানের মা'র নেই, সোনামণিকেই ত তা'রা নিতে আস্‌ছে। তা' ওকে চন্দ্রদ্বীপে পাঠিয়ে দিন্ না। দেওয়ানের কথা রাণী এইবার শুনলেন না। তিনি সোনামণির জন্য ব্যাকুলা হ'য়ে শ্রীমন্ত ঠাকুরের পরামর্শে তাঁ'র সঙ্গে সোনামণিকে তাঁর শ্বশুর-বাড়ী চন্দ্রদ্বীপে পাঠিয়ে দিলেন। শ্রীমন্তের মনোবাসনা এইরূপে পূর্ণ হ'ল।

দেওয়ান রঘুনন্দন, চর পাঠিয়ে জানলেন সবই মিথ্যা। খিজিরপুরে যে চর গিয়েছিল সে গিয়ে রাজা চাঁদ রায়ের কাছে সোনামণিকে তাঁ'র শ্বশুর বাড়ী পাঠা'বার খবর, শ্রীমন্তের যুদ্ধে পরাজয় ও রাজাদের বন্দী হওয়ার খবর সব বল্‌ল। রাজা ত শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি শ্রীপুরে গিয়ে দেখলেন শ্রীমন্ত সোনামণিকে নিয়ে সত্যিই পালিয়েছে। যা' হ'বার তা' হ'য়ে গেছে। সোনামণিকে নিয়ে শ্রীমন্ত ঠাকুর ঈশা খাঁর রাজধানীতে, ঈশা খাঁর অন্দরমহলে ঢুকে পড়ল।

সোনামণির ভাল জ্ঞান ছিল না—যখন জ্ঞান হ'ল তখন তিনি চেয়ে দেখলেন, এক সুন্দর সাজানো ঘরে তিনি শুয়ে আছেন। ক্রমে সব প্রকাশ হ'ল।

স্বর্ণময়ী সোনামণি বা সোনা বিবি নাম নিয়ে ঈশা খাঁর রাণী হ'লেন। রাজা চাঁদ রায় অভিমানী রাজা ছিলেন— এই দারুণ অপমানে একেবারে মুসড়ে গেলেন।

বেশী দিন সইতে হ'ল না তা'র এ অপমান; একদিন ভোর বেলায় তিনি তাঁ'র আরাধ্য দেবতা কোটীশ্বরের নাম জপ্‌তে জপ্‌তে চোখ বুজ্‌লেন।

রইলেন, একা রাজা কেদার রায়।

এক হাতে চোখের জল মুছে আর এক হাতে রাজ কার্য্য চালিয়ে তিনি প্রতিশোধের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন।

দাদা ত গেলেনই—প্রজারা রয়েছে, তা'দের যা'তে ভাল হয় সেই সব করতে যতদূর সাধ্য রাজা কেদার রায় উঠে পড়ে লাগ্‌লেন। তাঁ'র রাজ্যে যাতায়াতের ভাল রাস্তা ছিল না। যাতায়াতের কষ্টের মত কষ্ট আর নেই—তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে সেই কষ্ট দূর করে দিলেন। জলের কষ্টে প্রজারা কষ্ট পাচ্ছিল, পুকুর কাটিয়ে, দীঘি কাটিয়ে, খাল কাটিয়ে, নালা কাটিয়ে প্রজাদের সে সব কষ্ট নিবারণ করলেন, ছেলেরা পড়া শুনা করতে পারত না—ভাল পাঠশালা, মক্তব, কিচ্ছু ছিল না বললেই হয়, লেখা পড়া না শিখলে, প্রজাদের জ্ঞান না হ'লে নানা অসুবিধা হয়, তিনি ভাল ভাল পাঠশালা, মক্তব, টোল করে দিলেন, পূজো অর্চ্চনার জন্য, ধর্ম্মভাব

বৃদ্ধির জন্য গড়া'লেন মন্দির, মঠ ও মসজিদ্। লোকে ধন্য ধন্য করতে লাগ্‌ল। বলতে সুরু করল :—"এতদিনে রাজার মত রাজা হ'য়েছেন।"

তিনি সুন্দর সুন্দর সেনা-নিবাস, বিচারালয়, কারাগার, কোষাগার প্রভৃতি স্থাপন করে, কুল-দেবতা কোটীশ্বরের মন্দির গড়ে, কাঁচকীর দরজা গড়ে, দক্ষিণ বিক্রমপুরে কেদার-বাড়ী তৈয়ারী করে, উত্তর বিক্রমপুরে রাজবাড়ীর মঠ নির্ম্মাণ করা'য়ে, ঢোল সমুদ্র ও কেশার মার দীঘি কাটা'য়ে দেশে এক নবযুগের সৃষ্টি করলেন।

মোগলগণ পর্ত্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলে, কেদার রায় দেখলেন, পর্ত্তুগীজেরা জাহাজ পরিচালনা সকলের চেয়ে পটু, জল-যুদ্ধে ভারী ওস্তাদ, তা'দের পক্ষ নিলে মোগল সম্রাটকে ও আরাকানের রাজাকে সায়েস্তা করা যা'বে। এই ভেবে তিনি পর্ত্তুগীজদের পক্ষ নিলেন ও মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সন্দ্বীপ কেড়ে নিলেন, কেড়ে নিয়ে সেখানে পর্ত্তুগীজদেরে বসিয়ে দিলেন, আর তা'দের সেনাপতি কার্ভোলিয়াস্‌কে করলেন সন্দ্বীপের শাসন কর্ত্তা, এই ভাবে পর্ত্তুগীজেরা হ'ল তাঁ'র পক্ষ। আরাকানের রাজা, রাজা কেদার রায়ের প্রতি বিরক্ত হ'য়ে ১৫০ রণ-তরী নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন, কিন্তু জল-যুদ্ধে তাঁ'র সঙ্গে পারে কে? তিনি ১০০ রণ-তরী নিয়ে কামানের ধূয়ায় মেঘনার বুক

আঁধার করে ফেললেন। সে যুদ্ধের কথা অনেকে অনেক ভাবে বলেছেন। তেমন যুদ্ধ বাঙ্গালী আর করে নি, বোধ হয় করবেও না।

সকাল বেলা হ'ল সে যুদ্ধের সুরু। সারা দিন চল্‌ল সে যুদ্ধ—সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সন্ধ্যা-সূর্য্যের লোহিত কিরণে নীল আকাশের পশ্চিম প্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌ল রঙ্গীন, নীচে সৈন্যগণের লোহিত দেহ-শোণিতে নীল সমুদ্রের পূর্ব্বপ্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌ল লালে লাল।

রাজা কেদার রায় ভীষণ হ'তে ভীষণতর বেগে আরাকানের রাজার রণ-তরী আক্রমণ করলেন, ১৪০ খানা রণ-তরী রাজা কেদার রায়ের বাহুবলে তাঁ'র অধীন হ'ল, সমস্ত সৈন্য বন্দী করে রাজা কেদার রায় তা'দেরে নিয়ে এলেন রাজধানী শ্রীপুরে, আরাকান রাজ পরাজিত হ'লেন। পরাজয়ের সংবাদ শুনে, আরাকান-রাজ ক্রোধে দিশেহারা হ'য়ে উঠ্‌লেন। বহু অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে হাজার রণ-তরী পাঠা'লেন, কিন্তু রাজা কেদার রায় ভয় পা'বার লোক ছিলেন না। কামানের আগুনে সব পুড়ে, ডুবিয়ে দিলেন। আরাকান-রাজ ভাব্‌তে লাগলেন কি করা যায়।

এদিকে রাজা কেদার রায়ের মহাবীর পর্ত্তুগীজ সেনাপতি কার্ভোলিয়াস্ রণ-তরীর সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য এবং উত্তম নৌ-বহর গঠন করতে শ্রীপুরে এলেন।

শ্রীপুর, বাক্‌লা ও সাগরদ্বীপে রণ-তরীর আবশ্যকানুরূপ সংস্কারাদি হ'তে থাক্‌ল, সেনাপতি কার্ভোলিয়াস্‌ এই সমস্ত নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌লেন। সন্দ্বীপ ছেড়ে এলেন। এই অনুপস্থিতির সুযোগে আরাকান-পতি সন্দ্বীপ অধিকার করলেন।

মোগল-সেনাপতি ছিলেন রাজা মানসিংহ, তিনি এই সময়ই রাজা কেদার রায়কে আক্রমণ করা যুক্তিযুক্ত বোধ করে কোষা নামক ১০০ রণ-তরী রাজা কেদার রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দিলেন, যুদ্ধে ক্লান্ত রাজা কেদার রায়কে এই সময়ে আক্রমণ করলেই হয়ত রাজা পরাস্ত হ'বেন এই ছিল তাঁ'র ধারণা, তিনি বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ জল-যোদ্ধা মন্দা রায়কে তাঁ'র প্রেরিত নৌ-বাহিনীর সেনাপতি করলেন।

কিন্তু এই এত বড় সেনাপতি মন্দা রায় বা মধু রায়ও দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে অবশেষে রাজা কেদার রায়ের নিকট পরাজিত ও নিহত হ'লেন। পর্ত্তুগীজ বীর কার্ভোলিয়াস্‌ এই যুদ্ধে রাজা কেদার রায়ের নৌ-বাহিনী পরিচালনা করেছিলেন। সেনাপতি কার্ভোলিয়াস্‌ অতঃপর মোগল-গণের সকল জায়গা অধিকার করে, সুদূর হুগলী দুর্গ অবধি জয় করে ফেল্‌লেন।

দেখে শুনে আরাকান-পতি রাজা কেদার রায়ের সঙ্গে

সখ্য স্থাপন করে, তাঁ'কে প্রচুর সৈন্য ও অর্থদ্বারা সাহায্য করতে লাগ্‌লেন।

রাজা কেদার রায়ও এতে সমধিক উৎসাহিত হ'য়ে, সোনার গাঁ, বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চল হ'তে বহু সৈন্য সংগ্রহ করে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। মোগলের চিরশত্রু পাঠানবীর আহাম্মদ খাঁ রাজা কেদার রায়ের সঙ্গে মিশ্‌লেন। মোগল-শাসন-কর্তা ছিলেন, সুলতান কুলী খাঁ, তিনি এই সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহসী না হ'য়ে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করতে থাকলেন, কিন্তু রাজা কেদার রায় তাঁ'র রাজধানী আক্রমণ করে বসলেন। সুলতান কি করেন?—অগত্যা এই ঘোর বিপদের সংবাদ রাজা মানসিংহকে জানা'লেন। রাজা মানসিংহ অত্যন্ত চতুর ছিলেন। তিনি সম্মিলিত ত্রি-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যত না হ'য়ে প্রথমে যুদ্ধারম্ভ করলেন আরাকানের রাজার সঙ্গে, সুলতান কুলীকে সাহায্য করবার জন্য পাঠা'লেন সেনা-নায়ক আৎকার, দলপৎ রায় ও রঘুদাসকে।

ঘটনাক্রমে আরাকান-রাজের সঙ্গে হঠাৎ আবার রাজা কেদার রায়ের হ'ল মনোমালিন্য, ফলে একাকী যুদ্ধ করে আরাকানরাজ মানসিংহের নিকট পরাজিত হ'লেন।

রাজা কেদার রায় পরাক্রান্ত মোগল-সেনাপতি মন্দা রায়কে যুদ্ধে নিহত করলেন, এতে, মোগল-প্রতিনিধি রাজা মানসিংহের ভারী রাগ হ'ল; তিনি মাত্রা হারিয়ে ফেললেন

যখন শুনলেন যে মোগল-সেনাপতি কিলমক্‌ ও রাজা কেদার রায় কর্ত্তৃক বন্দী হ'য়ে তাঁ'র রাজধানীতে আছে।

তিনি বাংলায় এসে রাজা কেদার রায়কে চিরাচরিত প্রথামত তাঁ'র শৃঙ্খল ও তরবারি পাঠা'লেন।

রাজা কেদার রায় অবজ্ঞা ভরে শৃঙ্খলটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে তরবারি নিয়ে মানসিংহকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

তার পর তিনি স্বয়ং যুদ্ধে চললেন, চতুর্দ্দিকে রণ-ভেরী বেজে উঠ্‌ল। তাঁ'র বৃহৎ বৃহৎ ৫০০ কোষা নামক রণ-তরী নিয়ে তিনি অগ্রসর হ'লেন, যুদ্ধে রাজা মানসিংহ পরাজিত হ'লেন। রাজা কেদার রায়ের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

কিন্তু দুঃসময় যখন আসে তখন এমনই করে আসে যে কেউ তা'র গতি রোধ করতে পারে না।

একদিন, রাজা কেদার রায় একান্তভাবে করছিলেন তাঁ'র আরাধ্যা দেবীর ধ্যান—দেবীর মন্দিরে, দেবীর সাম্‌নে চোখ বুজে। এমন সময় রাজা মানসিংহ একজন গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে ধ্যানস্থ মহাবীর রাজা কেদার রায়ের মস্তক ছেদন করে ফেললেন।

এই সুযোগের সংবাদ দিয়েছিল, সেই গৃহ-শত্রু, বিশ্বাসঘাতক শ্রীমন্ত খাঁ। ভক্তবীর রাজার মস্তক ভূপতিত হ'তে হ'তেও "ছিন্নমস্তে নমস্তে, ছিন্নমস্তে নমস্তে" বল্‌তে বল্‌তে ইষ্ট নাম জপ করছিল।

এইরূপে বাংলার এই স্বাধীন হিন্দুরাজা কেদার রায়ের দেহাবসান ঘটে।

রাজার মৃত্যুতে তাঁ'র সৈন্যগণ হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়ল্। মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী ও সেনাপতি রঘুনন্দন রায় অনেক যুদ্ধ করলেন, সেনাপতি কালিদাস ঢালী, রামরাজা সর্দ্দার, পর্ত্তুগীজ ফ্র্যান্সিস্, শেখ কালু প্রভৃতিও অনেক যুদ্ধ করলেন। কিন্তু বাঙ্গালীর ভাগ্য ছিল না ভাল। অধঃপতন অনিবার্য্য হ'য়ে উঠ্ল। ফ্র্যান্সিস্ সাহেব ও শেখ কালুকে অর্থের প্রলোভনে বশ করে এবং রঘুনন্দনকে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে নামে মাত্র মোগলের আনুগত্য স্বীকার করতে অনুরোধ করে বাধ্য করলেন। কিছু দিন রাণীই রাজ্য চালা'লেন।

তা'র পর মোগল প্রতিনিধি এসে, ব্যবস্থা করে মন্ত্রী রঘুনন্দনকে দিলেন বিক্রমপুর পরগণা, সেনাপতি রঘুনন্দনকে দিলেন ইদিলপুর, শেখ কালুকে দিলেন কার্ত্তিকপুর, কালিদাস ঢালী পেলেন দেওভোগ আর রামরাজা সর্দ্দার পেলেন মুল-পাড়া তালুক।

হিন্দুর শেষ মহিমা-স্তম্ভ রাজা কেদার রায় নেই—রয়েছে তাঁ'র অগণিত কীর্ত্তি। সে সব কীর্ত্তির কথা আগেই

—চতুর্থ অধ্যায়—

—মুকুন্দরাম রায়—

"ঘর ঘর সম্পদ্ আপনায় নির্ভর,
সুপ্তের রাজ্যে দৈবের সাড়া,
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।"

ফতেজঙ্গপুরের কিয়দংশ নিয়ে ছিল বাংলার অন্যতম ভুঁইয়া বা ভৌমিক রাজা মুকুন্দরাম রায়ের রাজ্য। ফতেয়াবাদ পরগণা (বর্ত্তমান ফরিদপুর) ছিল ভূষণা চাকলার অন্তর্গত। যশোর, খুলনা, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের কতকগুলো পরগণা মিলে গড়ে উঠেছিল ভুষণা চাকলা।

রাজা মুকুন্দরাম রায় প্রথমে সামান্য জমিদার ছিলেন। তিনি সত্যি সত্যি, কবির কল্পিত আপনার পায়ে দাঁড়িয়ে সুপ্তের রাজ্যে, নিদ্রিত বাঙ্গালীর দেশে, দৈবের সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে কেমন করে আপনার পায়ে দাঁড়া'তে হয়। তিনি নিজের বাহুবলে, অধিকার বাড়িয়ে, তখনকার দিনে, বাংলার বিখ্যাত বার ভুঁইয়ার অন্যতম বিশেষ পরাক্রমশালী ভুঁইয়া রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। মহাপরাক্রমশালী পাঠান ও মোগল সবারই সাথে তিনি সুদীর্ঘকাল সমানে [illegible]।

মোগল পাঠানের যুদ্ধে ফতেয়াবাদের পাঠান মোরাদ খাঁ মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। এই মোরাদ খাঁর বন্ধু ছিলেন মুকুন্দরাম রায় মহাশয়। উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তা কতুল খাঁ, মোরাদ খাঁর রাজ্য সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করতে অসংখ্য সৈন্য নিয়ে মোরাদ খাঁর মৃত্যুর পর তাঁ'র নাবালক পুত্রগণকে আক্রমণ করেন কিন্তু নাবালকগণের পিতৃবন্ধু মুকুন্দরাম রায় ঘোরতর যুদ্ধ করতে আরম্ভ করেন।

বাদশার তখনকার প্রতিনিধি ছিলেন, রাজা তোডর মল্ল। তিনি মুকুন্দরাম রায়ের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'য়ে মুকুন্দরাম রায়কে ফতেয়াবাদের অধিকাংশ স্থানের শাসন-কর্তৃত্ব দান করেন এবং তাঁ'কে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন।

রাজা হ'য়ে মুকুন্দরাম রায় নানা সদনুষ্ঠানে রত হ'লেন। এত সদাশয়তা দেখা'তে লাগলেন যে তাঁ'র প্রজারা তাঁ'র একান্ত অনুরক্ত হ'য়ে উঠল।

রাজকার্য্য চল্‌ছিল বেশ—কিন্তু সায়দ খাঁ নামে একজন মোগল হ'লেন বাংলার শাসন কর্ত্তা। তিনি মুকুন্দরাম রায়কে পদচ্যুত করলেন। রাজা মুকুন্দরাম রায় এ অপমান সইবার লোক ছিলেন না। নিজে মহাবীর ছিলেন। তিনি পদাহত সর্পের মত গর্জ্জে উঠে সাম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

ফতেজঙ্গপুরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হ'ল। কামানের গর্জ্জনে, সৈন্যগণের হুঙ্কারে, অশ্বগণের হ্রেষারবে, কান বধির হ'য়ে উঠ্‌ল। রাজা মুকুন্দরাম রায় জয়লাভ করলেন। জয়োল্লাসে তিনি ফিরছিলেন রাজধানীতে, এমন সময় সংবাদ এল, বাংলার শাসন-কর্ত্তা সায়দ খাঁর নিযুক্ত ফতেয়াবাদের নূতন মোসলমান শাসন-কর্ত্তা তাঁ'কে যুদ্ধে ব্যাপৃত ও যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবস্থিত জেনে তাঁ'র অরক্ষিত রাজপুরী করলেন আক্রমণ।

রাজা এই দুঃসংবাদ শুনে ছুটে এলেন বাড়ীতে। ব্যস্ত হয়ে প্রতিকার করতে উদ্যত হ'চ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ সায়দ খাঁ সসৈন্যে—রাজা মুকুন্দরাম রায়ের রাজধানী ফতেজঙ্গপুর আক্রমণ করিলেন। দুই বিপুল সৈন্যের সহিত অসম্ভব যুদ্ধ করিয়া রাজা পরাজিত ও নিহত হ'লেন। রাজা মুকুন্দরাম রায়ের ছয়টী ছেলে ছিলেন। তন্মধ্যে পিতৃভক্ত পুত্র শত্রুজিৎ পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে অবশেষে পরাজিত ও বন্দী হ'লেন। দিল্লীতে বন্দী অবস্থায় তাঁ'র দেহাবসান ঘটল। শত্রুজিতের নামানুযায়ী যশোরে "শত্রুজিতপুর" বলে একখানি গ্রাম এখনও রয়েছে।

ফতেয়াবাদের কায়স্থ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মুকুন্দরাম রায়ের স্বজাতি-হিতৈষণা আমরা তাঁ'র সমাজের অসংখ্য কুলীন

কায়স্থগণের জায়গীরসমূহ হ'তেই বিশেষ ভাবে বুঝ্‌তে পারি।

কায়স্থ-কুল-তিলক রাজা মুকুন্দরাম রায় নেই—কিন্তু তাঁ'র সযত্ন প্রতিষ্ঠিত "ভূষণা সমাজ", বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণীর "ভূষণাপটী" এখনও তাঁ'র কীর্ত্তি ঘোষণা করছে। সত্যি এই ভৌমিকেরা—এক এক জন এক একটী রত্ন। এঁদের জন্মে দেশ ও কুল গৌরবোজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে।

—পঞ্চম অধ্যায়—

—লক্ষ্মণ মাণিক্য—

"মেঘমন্দ্র, কুলিশ নিস্বন, মহারণ, ভূলোক দ্যুলোক ব্যাপী
অন্ধকার উগরে আঁধার, হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয় বায়ু,
ঝলকি ঝলকি তাহে ভায়, রক্তকায় করাল বিজলিজ্বালা,
ফেনময়, গর্জ্জি মহাকায়, ঊর্ম্মিধায়, লঙ্ঘিতে পর্ব্বত-চূড়া।"

—বিবেকানন্দ—

"বাছা! ভেবো না, ভোরে এখানেই পা'বে কূল। কূলে উঠে মাটি খুঁড়ো। খুঁড়লেই দেখ্‌বে আমার পাথরের মূর্ত্তি, প্রতিষ্ঠা করো এই খানে, তুমি হ'বে এখানকার রাজা।"

তখন রাত্রি শেষ হ'য়ে এসেছে, তন্দ্রার ঘোরে বিশ্বম্ভর শূর দেখলেন, এমনই এক স্বপ্ন, স্বপ্ন দেখে তিনি জেগে উঠ্‌লেন। জেগে উঠে, সবার কাছে বল্‌লেন তাঁ'র স্বপ্নের কথা।

ক্রমে রাতের আঁধার দূরে গেল। পূব দিকে উঠ্‌ল অরুণ। পাখীরা ডাকূল। তা'দের ডাকে, সকলে জেগে উঠে, সবিস্ময়ে দেখলেন, যেখানে আগের দিন অগাধ জল কর্‌ছিল থৈ থৈ, সেখানে এক প্রকাণ্ড বালুকাময় ভূমি করছে ধূ-ধূ।

বিশ্বম্ভর শূর ছিলেন মিথিলা বাসী রাজা আদিশূরের বংশধর যাচ্ছিলেন, সপরিবারে, নৌকারোহণে চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন করতে। নৌকো মেঘনা বেয়ে চল্‌ছিল। রাত্রি কাল—মাঝিরা মেঘনার অকূল জলে ফেলেছিল দিক্ হারিয়ে। সেখানে মেঘনা সমুদ্রের মত বিস্তীর্ণ। জলহীন দেশের লোক—নদীর এমন বিস্তার দেখে পাচ্ছিলেন ভয়। ভয়ে ভয়ে ঘুম, ঘুম ত নয় তন্দ্রা, সেই তন্দ্রা ঘোরে দেখছিলেন স্বপ্ন। স্বপ্নে যা, দেখছিলেন তা'ত আগেই বলেছি।

স্বপ্নাদেশ পেয়ে, দেবীর নির্দ্দেশ মত মাটি খুঁড়ে, সত্যি সত্যি পেলেন মার এক পাথুরে বারাহী মূর্ত্তি, স্থির হ'ল সেই দিনই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হ'বে। ব্রাহ্মণ ত সঙ্গেই ছিলেন, প্রতিষ্ঠায় কোনই কষ্ট হ'ল না।

কিন্তু সারাদিন উঠ্‌ল না এতটুকুনও রোদ। আকাশ রইল কুয়াসায় ছেয়ে। কিচ্ছু দেখবার উপায় নেই, সেই আঁধারে আঁধারেই হ'ল মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা। মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেই যে নৌকা ছেড়ে দেবেন তা'রও উপায় রইল না। কুয়াসা না দূর হ'লে নৌকা ছাড়বার উপায় নেই। সে নৌকায় ত আর কম্পাস্ বা দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র ছিল না—দিক্‌ভুল হ'লে সমুদ্রে পড়ে যে যা'বে প্রাণ। কাযেই তাঁ'রা সারা দিন রাত রইলেন সেই চড়াতেই।

পরদিন সূর্য্যোদয় হ'ল, সকলে চেয়ে দেখলেন, দেবীকে

স্থাপন করা হ'য়েছে পূর্ব্বাভিমুখে, বিশ্বম্ভর শূর মশাই তা'দেখে বলে উঠলেন—পশ্চিমে লোক কিনা তা'ই—"ভুল্ হুয়া" অর্থাৎ ভুল হয়েছে। সেই থেকে আজ অবধি ঐ জায়গার নাম হ'য়ে রয়েছে "ভুলুয়া"! দেবদেবীর মূর্ত্তি দক্ষিণ বা পশ্চিমমুখী করে স্থাপন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে হ'ল তা'র ব্যতিক্রম—ভুল। এই ভুলুয়া পরগণা আজকাল নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত। ভুলুয়ার এই মা বারাহী দেবীর তিন তিনটে মুখ, চারটে হাত। দেবীমূর্ত্তি এখনো আছে, "আমিক্ষাপাড়া" বলে এক গ্রামে, পুরোহিত গণের বাড়ীতে দর্শকেরা তাঁ'র দেখা পেয়ে থাকেন।

বিশ্বম্ভর শূরের অধস্তন চতুর্থ পুরুষই হচ্ছেন আমাদের বাংলার দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক লক্ষ্মণ মাণিক্য মশাই।

বিশ্বম্ভর শূর মশাই সত্যি সত্যি মার কৃপায় রাজা হ'লেন। সব লোক হ'ল তাঁ'র বাধ্য। তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়—বাংলা দেশে খাঁটি ক্ষত্রিয় কেউ ছিলেন না। অথচ তাঁ'দের থাক্‌তে হ'বে এই দেশে। ছেলে হ'ল, মেয়ে হ'ল। বিয়ে দিতে হ'বে ত? ক্ষত্রিয়োচিত যা'কিছু কাযকর্ম্ম সবই করতেন কায়স্থেরা। এইজন্য তিনি কায়স্থদের সঙ্গেই বিয়ের সম্পর্ক করতে লাগলেন। তখন ত আর রেলগাড়ী, ষ্টীমার, মোটর, এরোপ্ল্যান্ ছিল না—শীগ্‌গির

শীগ্‌গির কোথাও যাওয়া যেত না, কাযেই বারবার মিথিলায় যাওয়ার চেয়ে, তিনি তাঁ'র মেয়েকে, গাভার পরমানন্দ ঘোষের সঙ্গে বিয়ে দেন। চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ সমাজ এতে ভারী ক্ষুণ্ণ হ'ন। পরমানন্দ ঘোষ মশাই একঘরে হন। নিরুপায় হ'য়ে তিনি ভুলুয়ায় তাঁ'র শ্বশুর মশাইর কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলেন। এই সংবাদে লক্ষ্মণ মাণিক্য মশাই অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়ে, এর প্রতিকারে সচেষ্ট হন।

রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য, চন্দ্রদ্বীপ-সমাজাধিপতি রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের পুত্র রাজা রামচন্দ্র রায়, বিক্রমপুর সমাজাধিপতি রাজা কেদার রায়, ভূষণা-সমাজাধিপতি রাজা মুকুন্দরাম রায় মহাশয় ও যশোহর সমাজাধিপতি রাজা প্রতাপাদিত্যের নিকট তাঁ'র জামাতা গাভার পরমানন্দ ঘোষের দুর্দ্দশার কথা, বিস্তারিত ভাবে, সবিনয় জ্ঞাপন করলেন।

তাঁ'রা সকলেই অত্যন্ত সদ্বিবেচক লোক ছিলেন। সকলেই বুঝলেন, লক্ষ্মণ মাণিক্য উচ্চবংশের সন্তান, গাভার ঘোষেরাও উচ্চবংশ। তা'ছাড়া রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য একজন বিশিষ্ট রাজাও বটেন! এমতস্থলে তাঁ'দের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করলে অপরাপর কায়স্থগণের কোনই অন্যায় হয় না। এই সমস্ত ভেবে, সমস্ত দলপতিই ভুলুয়ার অধিপতিকে সাহায্য করতে সম্মত হ'লেন।

রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের বাড়ীতে একটী বিয়ে উপস্থিত হ'ল, সকলেই সেই বিয়েতে যোগ দান করলেন, এলেন না কেবল বিক্রমপুরের জন কয়েক অভিমানী কায়স্থ। দলপতিরা তাঁ'দেরে সমাজচ্যুত করলেন ও ঘটকদেরে দিয়ে লিখা'লেন ঃ—

"বেচাগ্রাম স্থিতা সর্ব্বে
যে চতুর্ম্মণ্ডলে স্থিতাঃ
চান্দনী-চাকুলী চৈব
নাস্তি তেষাং কুলং বুধাঃ"

এইজন্য, বিক্রমপুরান্তর্গত বেজগাঁ, চতুর্ম্মণ্ডল, চান্দনী ও চাকুলীবাসিগণ কুলহীন হ'লেন।

মগদের অত্যাচারের কথা আগেই বলেছি। তা'রা বড়ই বাড়াবাড়ি সুরু করলে। রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের রাজ্যেও লুঠ্ তরাজ আরম্ভ করে দিলে। একে একে তিন তিন বার রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য তা'দের তাড়িয়ে দিলেন, সমাজপতিদের সঙ্গে যুক্তি করে সামাজিক শাসনের সৃষ্টি করে এক আজ্ঞা প্রচার করলেন যে কারও বাড়ীর উপর দিয়ে অক্ষত শরীরে কোন মগ চলে গেলে তা'কে সমাজে অচল করা হ'বে। কিন্তু এত করেও মগদের শাসন করা সম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল না। গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার ন্যায় তা'রা আবার নূতন উপায়ে দেশের লোকদেরে জ্বালাতন সুরু করলে।

রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের ছিলেন এক ভাই, তিনি বড় ভাইকে তাড়িয়ে নিজেই রাজা হ'বেন এমন একটা ষড়যন্ত্র করছিলেন। সেই গৃহ-শত্রু বেশ জান্‌তেন যে মগদের রাজা আরাকানাধিপতিই হচ্ছেন তাঁ'র দাদার প্রধান শত্রু। তিনি সেই শত্রুর সঙ্গে গোপনে করলেন মিত্রতা। মিত্রতা করে বাইরের কুমীরকে ঘরে ডেকে আন্‌বার ব্যবস্থা করলেন। আরাকানরাজকে ভুলুয়া আক্রমণ করতে পরামর্শ দিলেন। নিজেও কতকগুলো লোভী, বর্ব্বর সৈন্য নিয়ে ভাইয়ের বিরুদ্ধে সহসা যুদ্ধ সুরু করে দিলেন। ষড়যন্ত্রে রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য পরাস্ত হ'লেন ও রাজ্য ছেড়ে খিজিরপুরে গিয়ে, অন্যতম ভৌমিক ঈশা খাঁ মসনদ্-ই-আলির শরণাপন্ন হ'লেন, ঈশা খাঁর সঙ্গে ছিল বাদশার পরমপ্রিয় রাজা মানসিংহের ভাব। মানসিংহ বাদশাকে লিখে, বাংলার সেনাপতিকে নিয়ে, বাংলার বারভূঁইয়ার সাহায্যে মগদের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন।

সহর কস্‌বায় যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। যুদ্ধে—মগেরা এমন ভাবে পরাজিত হ'ল যে একজন মগও ভুলুয়া অঞ্চলে থাকতে পারলে না। এই যুদ্ধের মত যুদ্ধ বড় একটা হয় না, এখনও কস্‌বার মাটি খুঁড়ে সেই যুদ্ধের বন্দুক, কামান, তীর, ধনুর চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়।

তখনকার যুদ্ধ, এখনকার যুদ্ধের মত ছিল না। বারুদ গেঁদে বন্দুক ও কামান ছোড়া হ'ত, এখন মেসিনে মিনিটে মিনিটে বহু গুলি ছোড়া হয়, তখন কার্টিজ ছিল না, মেসিন ছিল না। এখন কার্টিজ ও মেসিন্ হয়েছে। তখনকার কামান, বন্দুক ছুঁড়তে হ'ত কত দেরী, ততক্ষণ— কিন্তু শয়ে শয়ে গুলোলের গুলি, ধনুকের তীর এসে বিপক্ষের প্রাণ করত নাশ, তখন এখনকার মত বন্দুক আর কামান দিয়ে ঠিক যুদ্ধ চলত না। দূরের শত্রুদের ধ্বংস, ও দুর্গ ভাঙ্গবার জন্যই কামান, বন্দুক বেশী চালানো হ'ত। নিকটে যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে হ'ত তরোয়ালে তরোয়ালে, বর্শায় বর্শায় যুদ্ধ।

এইভাবে ভুলুয়ায় লক্ষ্মণ মাণিক্য আবার রাজা হ'লেন। তাঁ'র রাজা হ'বার লোভী ভাই পড়লেন ফাঁপরে। অগত্যা তিনি দাদার শরণাপন্ন হ'লেন। এতদিন পরে কুচক্রী ভাইকে ফিরে পেয়ে রাজার বড় আনন্দ হ'ল। তিনি বারাহী দেবীর পূজার বিশেষ ব্যবস্থা করলেন ও বহু ভূ-সম্পত্তি দেবোত্তর করে দিয়ে মায়ের এই বিশেষ কৃপার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। এ ছাড়া রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য নানা জায়গা থেকে বহু বিদ্বান্ ও গুণবান্ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যাদি [illegible] এনে, জায়গীর দিয়ে ভুলুয়াতে স্থাপন করলেন।

রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য যশোরের রাজাকে বিয়েতে অধিক সম্মান করেন। এতে যশোরের রাজার জামাতা চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায় ভারী রেগে যান এবং সৈন্য সামন্ত ও জাহাজ নিয়ে রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। রাজা রামচন্দ্র ছিলেন যুবক, এদিকে লক্ষ্মণ মাণিক্য নিজে ছিলেন অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ। তাঁ'র শক্তির কথা শুনলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। তিনি প্রত্যহ এক এক মণ লোহার এক একটা মুগুরের দু'টো মুগুর ভাঁজতেন। এক মণ লোহার বর্ম্ম পরে নামৃতেন যুদ্ধে, তাঁ'র মত এত ভারী জিনিষ পরে যুদ্ধ করতে বড় বেশী শোনা যায় না।

গায়ে বল থাকলে, অনেক সময় মানুষ একটু হঠকারী হ'য়ে উঠে। রাজা লক্ষ্মণ মাণ্যিক্যেরও তা'ই হ'ল! যুদ্ধে রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য রাজা রামচন্দ্র রায়কে নিজ হাতেই ধরে আন্‌বার জন্য এক লাফ দিয়ে তাঁ'র রণ-তরীতে পতিত হলেন। কিন্তু একা কি করবেন, কি হ'বে তা' আর ভাব্‌লেন না! যা' হ'বার তা'ই হ'ল। রাজা রামচন্দ্র বহু সৈন্যের সহায়তায় তাঁ'কে বন্দী করে চন্দ্রদ্বীপে নিয়ে গেলেন।

চন্দ্রদ্বীপে নিয়ে তাঁ'র প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। কিন্তু রাজা রামচন্দ্রের মা এমন বীরকে হত্যা করতে মানা

করলেন। রাজা মায়ের কথা মত লক্ষ্মণ মাণিক্যকে তাঁ'র কারাগারে বন্দী করে রাখ্‌লেন।

রাজা রামচন্দ্রের ভারী সখ হ'ল যে রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের শরীরে কত বল আছে, তিনি কেমন বীর একবার নিজে পরীক্ষা করে দেখ্‌বেন। এই মনে করে, তিনি রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যকে কারাগার হ'তে শৃঙ্খল মুক্ত করে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। লক্ষ্মণ মাণিক্য শৃঙ্খল মুক্ত হ'য়েই রাজা রামচন্দ্রকে বধ করতে উদ্যত হলেন। রাজা রামচন্দ্রের দেহরক্ষিগণ লক্ষ্মণ মাণিক্যকে ধরে ফেলে, রামচন্দ্রের প্রাণ রক্ষা করল।

এইবার রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের অন্তিম কাল ঘনিয়ে এল, রাজা রামচন্দ্রের মা হুকুম দিলেন, লক্ষ্মণ মাণিক্যকে কেটে ফেলতে। ঘাতক তৎক্ষণাৎ তাঁ'র আদেশ পালন করল। সামাজিক কেলেঙ্কারীতে যা'র হয়েছিল সৃষ্টি সেই আগুনে বঙ্গের এমন বীর চলে গেলেন, আর আস্‌বেন কিনা কে জানে!

—ষষ্ঠ অধ্যায়—

"আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়ল তরী
এ কোন্ সোণার গাঁয় !
ভাটার তরী আবার কেন
উজান যেতে চায় ?

—নজরুল ইস্‌লাম

—রাজা কংসনারায়ণ—

রাজা কংস নারায়ণের কথা বল্‌তে হ'লে তাঁ'র সুযোগ্য পূর্ব্বপুরুষ রাজা গণেশনারায়ণের কথাও বলা একান্ত প্রয়োজন। তখনকার কালে এই রাজা গণেশই এক মাত্র হিন্দুরাজা ছিলেন যিনি একাদিক্রমে সাত সাত বৎসর কাল দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে হিন্দু রাজত্ব পরিচালনা করে গিয়েছিলেন।

কেহ কেহ বলেন এই রাজা গণেশ সাহাবুদ্দীন বয়াজিদ নাম ধারণ করে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছিলেন। তিনি কঠোর, কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজা বলে বিখ্যাত ছিলেন। হিন্দু মোসলমান নির্ব্বিশেষে সবার প্রতি যথাযথ শাস্তির

বিধান করতেন বলে অনেক স্বার্থান্ধ ঐতিহাসিক তাঁ'র শত শত নিন্দা করে গেছেন। সম্প্রতি "সাহাবুদ্দীন বয়াজিদ" নামে রাজা গণেশের অনেক মুদ্রাও পাওয়া গেছে। তাঁ'র একান্ত প্রীতিভাজন সোলতান ছিলেন সাহাবুদ্দীন বয়াজিদ, হয়ত সেই জন্যই তিনি এরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন বলে অনেকে অনুমান করেন। এই রাজা গণেশের একমাত্র ছেলে ছিলেন জালালউদ্দিন। তাঁ'র প্রকৃত নাম ছিল যদুনারায়ণ, জিতমল্ল বা জয়মল্ল। এই যদুনারায়ণের পুত্র ছিলেন অনুপনারায়ণ। তিনি একটাকিয়া জমিদারীর মালীক হন বলে ইতিহাসে লেখা আছে।

রাজা গণেশ যে নির্ভীক ছিলেন তা'তে আর সন্দেহ নেই। তিনি শেখ নুর কুতুব-উল্-আলমের পুত্র শেখ আনোয়ারকে এবং শেখ জাহিরকে কোন বিশেষ অপরাধে কারারুদ্ধ করেছিলেন। তাঁ'রই আদেশে শেখ নূর কুতুব-উল-আলমের অনুচরদের সম্পত্তি লুঠ হয়। উক্ত শেখ সাহেব একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, তদানীন্তন গৌড়ীয় মোসলমান সমাজে শেখ নূর আলমের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ, সুতরাং রাজা গণেশের সামরিক বল ও প্রভাব যে অত্যন্ত বেশী ছিল তা'তে আর সন্দেহ নেই। তিনি যে মোসলমান হয়েছিলেন একথা বিশ্বাস করা যায় না।

রাজা গণেশের নাম, ধাম, কীর্ত্তিকলাপ নিয়ে এক একজন ঐতিহাসিক, এক এক কথা বলেছেন। তাঁ'র বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন, মোসলমান ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন, তাঁ'র "রিয়াজ্-উস্-সালাতীন" গ্রন্থে। তা'ছাড়া অপরাপর মোসলমান ঐতিহাসিকদের প্রণীত—"তারিখ-ই-ফেরেস্তা", "তবকাৎ-ই-আকবরীতে"ও রাজা গণেশের কথা আছে, কয়েকখানি হিন্দু কুলগ্রন্থেও রাজা গণেশের কথা অল্পাধিক পাওয়া যায়।

সুপ্রাচীন রেনেলের মানচিত্রে বাঙ্গালার এক বিস্তীর্ণ ভূভাগকে ভাতুড়িয়া পরগণা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তা'র পশ্চিমে দেওয়া হয়েছে মহানন্দা নদী এবং পুনর্ভবা নদী, দক্ষিণে দেওয়া হয়েছে গঙ্গা, পূর্ব্বে করতোয়া। নাটোরও এই ভাতুড়িয়া পরগণার অন্তর্গত ছিল বলে জানা যায়। বুকানন্ হ্যামিলটন্ সাহেব বলেন :—এই রাজা গণেশ ছিলেন দিনাজপুরের হাকিম। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁ'র বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের রাজন্যকাণ্ডে রাজা গণেশের নিবাস স্থান দিনাজপুর জেলার রাইগঞ্জ থানার গণেশপুরে বল নির্দ্দেশ করেছেন। তিনি বলেন :—রাজা গণেশই এই গণেশপুর হ'তে পাণ্ডুয়া অবধি এক রাজপথ নির্ম্মাণ করে দিয়েছিলেন। এখনও সে রাস্তা আছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের মতে রাজা গণেশ

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। তাঁ'র এক নাম ছিল দত্তখাস্ বা দত্তখান্।

রাজা গণেশ তখনকার দিনে অনেক টাকা ব্যয় করে দিনাজপুর জেলার রাইগঞ্জ থানা হইতে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত এক বড় রাস্তা তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। এই কথা আরও অনেকে বলেন।

তিনি প্রথম জীবনে, গিয়াস্-উদ্দীন আজমশার আমলে রাজস্ব এবং শাসন-বিভাগের কর্তৃত্ব করতেন। আজম-শাকে তিনি নিহত করেছিলেন এবং তাঁ'র পৌত্র সুলতান সমস্ উদ্দীনকেও তিনি নিহত করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। যুদ্ধে সমস্ উদ্দীনকে পরাভূত করে তিনি গৌড়-বঙ্গের অধীশ্বর হন। হিজরী ৮১৭ সাল অবধি তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁ'র নামাঙ্কিত এ সময়ের রজতমুদ্রাদি যে পাওয়া গিয়েছে তা'ত আগেই বলেছি। ৮১৮ হিজরায় অর্থাৎ ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে এই রাজা গণেশনারায়ণের পুত্র যদুনারায়ণ সুলতান জালালউদ্দীন মোহম্মদ শা নাম ধারণ করে গৌড় বঙ্গের সিংহাসনারোহণ করেন বলে মোসলমান ঐতিহাসিকগণের অনেকেই বলেছেন।

শেখ মইনুদ্দীন আববাসের পুত্র শেখ বদর-উল্-ইসলাম এই রাজা গণেশকে তাঁ'র পদমর্য্যাদানুরূপ সম্মান না করায় রাজা গণেশ তাঁ'র প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দান করেন।

"তারিখ-ই-ফেরেস্তা" গ্রন্থে রাজা গণেশের ভূয়সী প্রশংসা পাঠ করা যায়। সকল মোসলমান ঐতিহাসিকই একবাক্যে রাজা গণেশ যে একাদিক্রমে ৭ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন তা' বলেছেন।

১৪১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁ'র মৃত্যু হ'লে, বহু গৌড়ীয় মোসলমান তাঁ'কে প্রকৃত মোসলমানের ন্যায় গোর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হিন্দু মোসলমান যে কেহ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলেই যে তিনি কঠোর শাস্তি দিতেন, প্রকৃত দোষীকে যে তিনি কদাচ ক্ষমা করতেন না, এ সব কথাও মোসলমানদের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

তাঁ'র অভ্যুদয় কালে গৌড়-বঙ্গে সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হ'তে থাকে। মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন—পঞ্চদশ শতাব্দীতে, বঙ্গদেশে রাঢ়ীশ্রেণীর মহিন্তা-খাঁই বৃহস্পতি নামে একজন বড় পণ্ডিত রাজা গণেশ ও তাঁ'র মোসলমান উত্তরাধিকারীর নিকট "রায় মুকুট" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি একখানি স্মৃতি গ্রন্থ, অনেকগুলি কাব্যের টীকা ও অমর কোষের একখানি টীকা লিখেন। উহার এক এক খানি এক এক প্রামাণিক গ্রন্থ। রাজা গণেশের আমলে বাঙ্গালা-সাহিত্যেরও উন্নতি হয়েছিল। রাজা গণেশ ব্রাহ্মণগণের বহু অনাচার নিবারণেরও চেষ্টা করেছিলেন।

রাজা গণেশ নিজে মোসলমান হন নি বলে অনেকে কহ বলেছেন। তবে তাঁ'র ছেলে যতুনারায়ণ আজম শা'র রূপবতী কন্যার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁ'কে বিয়ে করবার জন্যই মোসলমান হয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিকদের অনেকেই বলে থাকেন।

আজম শা'র এই মেয়ের নাম ছিল, আসমানতারা। কেহ কেহ কিন্তু বলেন যতুনারায়ণের মোসলমান পত্নীর নাম ছিল ফুলজানি বেগম, যতুর সঙ্গে বিয়ের পরও এ নামান্তর হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

যতুর মৃত্যুর পর তাঁ'র ছেলে সমসুদ্দীন আহম্মদশা বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

রাজা গণেশ সম্পর্কে বহু মত। এক এক ঐতিহাসিক এক এক কথা বলেন। "রিয়াজ উস্ সালাতীন" তাঁ'র সম্পর্কে বিস্তারিত লিখলেও তাঁ'র লিখিত বিবরণ যুক্তিসহ নয় বলে অনেকের ধারণা।

আমরা অনেক অনুসন্ধান করে যে সত্যের উদ্ধার করতে পেরেছি, এখানে মোটামোটি তা'ই বললাম।

রাজা গণেশনারায়ণ যে একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন তা'তে আর সন্দেহ নেই। এত করে চাপা দেবার চেষ্টা করলেও তাঁ'র অমরকীর্ত্তি নানাভাবে, নানা ঐতিহাসিকের লেখনীতে ফুটে উঠেছে। তিনি সাতগড়ার প্রসিদ্ধ ভাতুড়ী

বংশসম্ভূত ছিলেন। তাঁ'র সময়ে পাণ্ডুয়া বাংলার রাজধানী ছিল। সৈয়দ সোলতান আসলতানের পালিতপুত্র আলিমশা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন, এই পাঠানদের অত্যাচার হ'তে স্বীয় প্রজাগণকে রক্ষা করবার জন্য রাজা গণেশনারায়ণ প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এতে তিনি আলিমশার চক্ষুঃশূল হন, তাঁ'কে বধ করবার জন্য আলিম শা অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হন না।

সুলতান আসলতানের মৃত্যু হ'লে আলিম শা সামসুদ্দিন সানি নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি অনবরত দেশের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে দিলেন।

রাজা গণেশনারায়ণের এ সব অসহ্য হ'ল তিনি বিদ্রোহী হ'লেন। সোলতানের সঙ্গে তাঁ'র প্রলয় যুদ্ধ হ'ল। সোলতান রাজা গণেশের নিকট পরাভূত হ'লেন!

গণেশনারায়ণ দুর্গ অধিকার করে, বাঙ্গালায় হিন্দু-রাজত্ব সংস্থাপন করেছিলেন।

এই যুদ্ধে রাজা গণেশের স্ত্রী করুণাময়ীও রাজার এই সমুদয় কার্য্যে প্রভূত সহায়তা করেছিলেন। ইনিই রাজা কংসনারায়ণের পূর্ব্ব পুরুষ।

পাঠান বাদশারা মোগলদের হাতে হেরে গেছেন, তাঁ'দের রাজ্য গেছে, বাংলায় এমন সময় রাজত্ব করছিলেন

রাজা কংসনারায়ণ। তিনি ছিলেন শুধু রাজা নন্, সমাজ পণ্ডিও। তাঁ'র প্রতাপের ছিল না অন্ত। পাঠান মোগল বাদশারা এত দুর্দ্দান্ত হ'লেও সব সময় তাঁ'র কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে পারতেন না। সুযোগ পেলেই তিনি খাজানা বন্ধ করে দিয়ে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করতেন। রাজা কংসনারায়ণের এক মন্ত্রী ছিলেন, তাঁ'র নাম ছিল—রমেশ শাস্ত্রী।

রাজার সঙ্গে মন্ত্রীর নানা শাস্ত্র নিয়ে আলাপ আলোচনা হ'ত। দু'জনেই ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন ও সেই সব নিয়ে গবেষণা করতে ভালবাসতেন।

একদিন কথা উঠ্‌ল, "দুর্গাপূজা" নিয়ে, মন্ত্রী শাস্ত্রী মহাশয় বললেন :—"কলিকালে অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ হ'য়েছে বলে, সেই যজ্ঞের তুল্য ফল লাভের প্রত্যাশায় অনেকে শারদীয়া দুর্গা পূজা করে থাকেন, ভেবে দেখেন না যে যে কারণে অশ্বমেধ করা নিষিদ্ধ হ'য়েছে, সেই কারণেই দুর্গাপূজাও হ'তে পারে না। যথাশাস্ত্র না হ'লে পূজা করে লাভ কি? এই দেখুন না, শাস্ত্রানুযায়ী দুর্গাপূজা করতে হ'লে যোগাড় করতে হয় চার সমুদ্রের জল, পর্ব্বতশৃঙ্গের মাটি, এমনই কত কিছু—সে সব কি কেউ সংগ্রহ করে পূজা করেন? যত সব বিকল্প আর অনুকল্পের

পালা—ও সবে কি আর পূজা হয়—না ঐ সব পূজায় শ্রদ্ধাভক্তি কিছু থাকে ?”

রাজা কংসনারায়ণ শাস্ত্র-গর্ব্বী, মন্ত্রী মশাইর কথাগুলি কাণপেতে শুনলেন।

তিনি বড় বংশের ছেলে—খাঁটি ব্রাহ্মণ সন্তান, তাঁ’র পূর্ব্বপুরুষ কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ ঠাকুর মহাশয়কে বঙ্গেশ্বর আদিশূর সযত্নে এনেছিলেন কান্যকুব্জ হ’তে। এত বড় বংশে জন্ম, নিজে অর্থশালী, প্রতাপশালী, জনবলে বলীয়ান্ হ’য়েও মায়ের পূজা যথাশাস্ত্র করতে পারবেন না ? তাঁ’র বড় অভিমান হ’ল। তিনি মন্ত্রী ও পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী মহাশয়কে বললেন—“আপনি যথাশাস্ত্র একটী ফর্দ্দ দিন্—যেমন করেই হ’ক্ আমি সব যোগাড় করে, আপনার বিধান মত মার পূজা করব।”

পণ্ডিত মহাশয় ফর্দ্দ দিলেন। তখন সব শস্তায় পাওয়া যেত তবু একুনে হয়ে উঠ্ল ছয় লাখ টাকা।

শুধু পূজাতেই এই ব্যয়। আনুষঙ্গিক খাওয়া দাওয়া, আমোদ উৎসবের জন্য অন্ততঃ আরও দুই তিন লাখ টাকার দরকার।

রাজা কংসনারায়ণের হুকুম হ’ল, তা’ই হবে, আমি আট লাখ লাগে, ন’ লাখ লাগে, খরচ করে পূজা করব। আপনি পূজা করুন্। পূজা হ’ল।

এইরূপ যাঁ'র ছিল ঐশ্বর্য্য সেই রাজা কংসনারায়ণ যে কিরূপ রাজা ছিলেন তা' সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

রাজা কংসনারায়ণকে মহাড়ম্বরে পূজা করতে দেখে, তাঁ'র সমসাময়িক, সমস্পর্দ্ধাসম্পন্ন কুস্থুন্তি ও প্রতাপবাজু পরগণার রাজা জগৎনারায়ণও নয় লাখ টাকা ব্যয় করে পূজা করলেন। রাজা কংসনারায়ণ করলেন দুর্গোৎসব, আর জগৎনারায়ণ করলেন, বাসন্তী।

তাঁ'দের দেখাদেখি সাতোরের রাজা ও অন্যান্য জমিদারগণ দুর্গা ও বাসন্তী উভয় পূজাই করতে থাকেন।

কথিত আছে, সম্রাট্ শাহজাহান তাঁ'র অধীন রাজাদের এইরূপ আড়ম্বর দেখে নিজে মোসলমান হ'য়েও এই পূজায় উৎসাহ দিতেন। তিনি অসামান্য সৌখীন ছিলেন। সখের জন্য কোটী কোটী টাকা ব্যয় করতেও কখনও পশ্চাৎপদ হন নি। তাঁ'র তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন প্রভৃতি এ সব কথার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সাতোরের রাজকুমার গঙ্গাধর সান্যাল মহাশয় ও দিনাজপুরের রাজভ্রাতা গোপীকান্ত রায় মহাশয়ও বহু ব্যয় বাহুল্য করে এই পূজা করেছিলেন বলে শুনা যায়।

পাঠান ও মোগলে যখনই যুদ্ধ বাঁধে তখনই রাজা কংসনারায়ণ মোগলদের পক্ষে যোগদান করেন। তিনি

পাঠানদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বলে স্থির করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এতে অনেক পরগণার রাজারা বিদ্বেষবশে পাঠানদের সঙ্গে যোগ দেন।

মোগলেরা জয়লাভ করলেন। কিন্তু যথেষ্ট সাহায্য করতে সম্মত হ'লেও রাজা কংসনারায়ণ নিজে সাহায্য করা ভিন্ন মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেননি।

—সপ্তম অধ্যায়—

—বীর হাম্বীর—

"সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়া-কায়া ধরি' ; তা'র পরে
সত্য দেখা দেয়, ভূষণ বিহীনরূপে
আলো করি' অন্তর বাহির !"

—রবীন্দ্রনাথ—

এইবার রাজা বীর হাম্বীরের কথা বল্‌তে যাচ্ছি। তিনি ছিলেন বর্ত্তমান বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতি বিষ্ণুপুরের রাজা। তাঁ'র আগে তাঁ'দের বংশের বহু রাজা সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করে, বিষ্ণুপুর রাজ্যকে সুপ্রসিদ্ধ করে গিয়েছিলেন। বীর হাম্বীর যখন রাজত্ব করছিলেন তখন ভারতবর্ষের সম্রাট্ ছিলেন মোগলকুলতিলক আকবর শাহ। সম্রাট্ আকবর শাহ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে চৌদ্দ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ ও ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ৪৯ বৎসর রাজত্ব করে ইহধাম ত্যাগ করেন ; তাঁ'র সময়ই বার ভুঁইয়াদের অভ্যুদয় হয় ও

তিনিই ভুঁইয়া বা ভৌমিক-প্রথা রহিত করে বঙ্গদেশে জমীদারী প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। ভুঁইয়াগণ স্বাধীনভাবে আপনাদের বাহুবলের পরিচয় দিয়ে বাঙ্গালীর ভীরুতা দুর্ণামের অনেকটা অবসান ঘটায়েছিলেন, ভুঁইয়াদের চেষ্টায় বাঙ্গালী সৈন্য গড়ে উঠেছিল, রণকৌশলে অভ্যস্ত হয়েছিল আর তাঁ'দের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালী জাতির দুর্গতি, বাঙ্গালী জাতির কাপুরুষতা ও অস্ত্রজ্ঞান-শূন্যতা ঘনীভূত হয়েছিল। আজ তা'রা আত্মরক্ষায়ও অক্ষম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

বিষ্ণুপুরের রাজাদের সাধারণ উপাধি মল্ল, আর তাঁ'দের জ্যেষ্ঠ কুমারকে বলা হ'য়ে থাকে "ধারি"। মল্লরাজদের রাজত্বের স্থানকে "মল্লভূমি" বলা হ'ত। বাংলার অপরাপর প্রাচীন রাজবংশের ন্যায় এই রাজবংশেরও ইতিহাস নানা কিংবদন্তী ও ঘটনা এবং স্থাপত্য-শিল্পাদি হ'তে সংগ্রহ করতে হচ্ছে। মল্লাব্দ বলে একটা অব্দ বা সালের প্রচলন আছে বিষ্ণুপুর রাজ্যে! এ অব্দটী আরম্ভ হয়েছে ৬৯৫ খৃষ্টাব্দ হ'তে। এতে করে আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে এখন হ'তে ১২৪১ বছর আগে এ বংশের পত্তন হয়।

রাজা আদি মল্ল এ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁ'র পিতা ছিলেন বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী জয়পুরের ক্ষত্রিয় রাজা।

তা' যা'ই হ'ক্—রাজা বীর হাম্বীর আবির্ভূত হয়েছিলেন, মোগল-সম্রাট্ আকবরের সমসময়ে অর্থাৎ ১৫৫৬ হ'তে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। পৈতৃক রাজধানী বিষ্ণুপুরই ছিল তাঁ'রও রাজধানী। ধলকিশোর নদীর তীরবর্ত্তী এই বিখ্যাত নগরী ভরে ছিল তাঁ'র পূর্ব্বপুরুষদের অগণিত কীর্ত্তিকাহিনীতে।

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ব অবধি বিষ্ণুপুরের রাজারা প্রায় স্বাধীনই ছিলেন, কিন্তু এই শতাব্দীর প্রারম্ভে যিনি রাজা হন তাঁ'র নাম "ধারি মল্ল" বলে ইতিহাসে বিখ্যাত। তিনি ঘটনা-চক্রে বাংলার নবাবকে এক লাখ সাত হাজার টাকা খাজনা দিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু এই অধীনতা অতি অল্প দিনের জন্যই তাঁ'র ভাগ্যে ঘটেছিল। কিছুকাল পরেই আবার তিনি পূর্ব্বভাব অবলম্বন করেন—ইচ্ছামত কর দিতে আরম্ভ করেন। নবাবও তাঁ'র সঙ্গে মিত্রের মত ব্যবহার করতে থাকেন।

রাজা ধারি মল্ল ইহলোক ত্যাগ করলে তাঁ'র পুত্র বীর হাম্বীর হন রাজা। তাঁ'র রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা, শাসন করবার প্রণালী এবং সৈন্য-দল গঠনের কৌশল এবং অসাধারণ শারীরিক শক্তি ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং প্রত্যুৎপন্ন-মতি দেখে সকলেই বিস্মিত হ'য়ে গেলেন। রাজা হ'য়েই তিনি তাঁ'র দুর্গগুলিকে সুদৃঢ় করে, চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী

শক্তিশালী রাজাদের সঙ্গে ভাব করে, তাঁ'র রাজ্যকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করে তুল্‌লেন। ইঙ্গিতমাত্র লক্ষ সৈন্য তাঁ'র জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হ'ল। সামন্ত রাজগণের সঙ্গে একান্ত-ভাবে সখ্য সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় বাইরের কোন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'লে তাঁ'রা তাঁ'র নির্দ্দেশ মত অর্থ ও সৈন্যাদি দ্বারা সাহায্য করতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করতেন না।

রাজা বীর হাম্বীর নিজে বীর ছিলেন—অন্যের বীরত্বেরও যথেষ্ট সমাদর করতেন। ফলে, তাঁ'র অধীন সামন্ত-রাজগণকে তিনি নানাভাবে উৎসাহিত করে, তাঁ'দের প্রত্যেককে দিয়ে গড়া'য়ে তুললেন তঁা'র রাজ্যময় ভাল ভাল দুর্গ। উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় তাঁ'রা হ'য়ে উঠ্‌লেন উন্মত্ত। তাঁ'দের নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ শাসন প্রণালীতে তিনি কদাচ হস্তক্ষেপ করতেন না—কাঁ'রও স্বাধীনতা কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না করে নানাভাবে সদ্ব্যবহার ও সদ্ভাব প্রদর্শন করায় তাঁ'রা উত্তরোত্তর রাজা বীর হাম্বীরের একান্ত বশীভূত ও অনুগত হ'য়ে পড়লেন। তাঁ'র সমসাময়িক সামন্ত-রাজগণের মধ্যে জামকুঁড়ি, বগড়ি, শিমলাপাল, ইন্দ্রহাস, রাইপুর, ধারাপাট, মালিয়াড়া শূরভূম, ডুম্‌নি, চন্দ্রকোণা, গড়বেতা, লোগা, বিহার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল।

তিনি তাঁ'র নিজের গড় অর্থাৎ দুর্গকে সর্ব্বতোভাবে দুর্ভেদ্য করবার জন্য তা'র চারিদিকে খুব উঁচু করে মাটির

স্তূপ গ'ড়ে উঠা'লেন। পাহাড়ের মত সেই উঁচু উঁচু জায়গায় স্থানে স্থানে বসানো হ'ল মজবুত সব কামান, আর স্তূপগুলোর বাইরে কাটানো হ'ল সুপ্রশস্ত সব খাল, বড় বড় বাঁধ দিয়ে ঘেরা হ'ল সারাটী রাজধানী। শত্রুর আক্রমণ হ'তে রাজধানীকে বাঁচা'বার জন্য সবগুলো বাঁধকে সহজে যা'তে এক করে দেওয়া যায় তা'র সুব্যবস্থা হ'ল, বাঁধগুলোর আয়তন করা হ'ল এক একটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রামের চেয়েও বড় বড়। এ সব ছাড়াও, রাজধানীর চারদিকে খোড়া হ'ল একটা মস্ত বড় খাল। কত জল তা'তে! কে আস্‌বে সে জল ডিঙ্গিয়ে—সহজে? কামান-গুলো যা' বসানো হ'ল তা'র তুলনা মেলে না। আশ্চর্য্য লম্বা লম্বা সেগুলোর গঠন ভঙ্গী আর পাল্লা। এখনও সেগুলোর নিদর্শন রয়েছে বিষ্ণুপুরে। বেশী না বলে, একটা কামানের কথাই বল্‌ছি, তা'র নাম—"দলমাদল"। তেমন বড় কামান বড় দেখা যায় না। এখনও সেটী আছে। গভর্ণমেণ্টের প্রাচীন-স্মৃতি-রক্ষা আইন অনুসারে সেই কামানটাকে এখনও সযত্নে রাখা হ'য়েছে। এই কামান "দলমাদলের" দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১২ ফিট্, ৫½ ইঞ্চ্, পরিধি হচ্ছে ১১½ ইঞ্চ্। এত দিন গিয়েছে, এত রোদ বাতাস লেগেছে, ধুলো কাদা লেগেছে তা'র গায় তবু পড়েনি তা'তে এতটুকুনও মরিচা! কত দামী, কেমন লোহা ছিল!
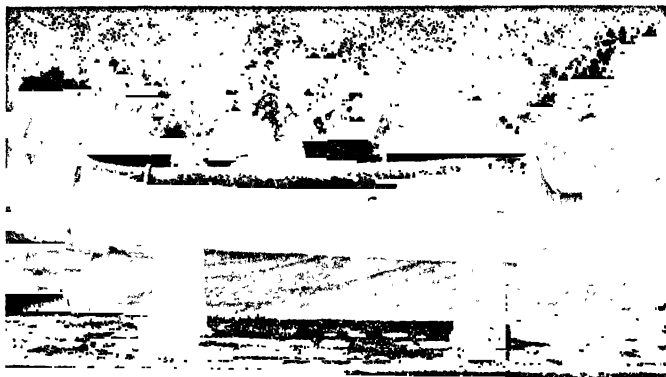
THE DALMADAL GUN was
ERECTED ON THIS SPOT BY THE
GOVERNMENT OF BENGAL 1919

দলমাদল কামান।

রাজা বীর হাম্বীরের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ, মোগলদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেই রাজ্য পরিচালনা করে [illegible]। কিন্তু রাজা বীর হাম্বীরের সময় নবাব সুলেমান্ কর্ণাণীর ছেলে নবাব দায়ুদ খাঁ অসন্তুষ্ট হ'য়ে অকস্মাৎ তাঁ'র রাজধানী বিষ্ণুপুর করে বস্‌লেন আক্রমণ। কিন্তু রাজা বীর হাম্বীর ভীত হ'বার পাত্র ছিলেন না। যুদ্ধগুলোকে তিনি ছেলে খেলার মতই মনে করতেন। অকুতোভয়ে, দুর্দ্ধর্ষ সেই নবাবের বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হ'য়ে তিনি অসীম পরাক্রম প্রদর্শন করে তাঁ'কে সম্পূর্ণ পরাজিত করলেন। নবাব দাউদ্ খাঁর অসংখ্য মহাবলপরাক্রান্ত সৈন্য এমন সাঙ্ঘাতিক ভাবে আক্রান্ত ও নিহত হয়েছিল যে রাজা বীর হাম্বীরের দুর্গের পূর্ব্ব দরজায় তা'দের মুণ্ডে মুণ্ডময় ও শবে শবময় হ'য়ে গিয়েছিল, শত্রু নবাব পক্ষের সৈন্যগণের অগণিত মুণ্ড পতিত হ'য়েছিল বলে, সেই হ'তে সেই ঘাটেরই নাম হ'য়ে যায়—"মুণ্ডমালা ঘাট"।

নবাব দাউদ খাঁর সেনাপতি ছিলেন বিখ্যাত বীর কুতুব খাঁ। তিনি পশ্চিম বঙ্গ জয় করে, বৃহৎ সৈন্যদলসহ রাজা বীর হাম্বীরের রাজধানী বিষ্ণুপুর হ'তে ২১ মাইল পূর্ব্বে সেনা-নিবাস স্থাপন করলেন এবং সেই স্থানের নাম তাঁ'র নামানুসারে কোতুলপুর বলে অভিহিত করলেন, প্রাধান্য স্থাপনের জন্য তঁা'র অদম্য স্পৃহা উত্তরোত্তর বাড়তে

দেখে সম্রাট্ আকবর তাঁ'কে দমন করবার জন্য তাঁ'র বিখ্যাত সেনাপতি মানসিংহ ও তাঁ'র ছেলে জগৎ সিংহকে পাঠিয়ে দিলেন। কতুল খাঁ যে সে বীর ছিলেন না—পাছে কোন বিপদ্ হয় ভেবে পরম বুদ্ধিমান্ রাজা বীর হাম্বীর জগৎসিংহকে পূর্ব্ব হ'তেই সাবধান করে দিলেন কিন্তু জগৎসিংহ তাঁ'র সে সাবধান হ'বার ইঙ্গিত না মেনে বিপন্ন হ'য়ে পড়লেন। ইলিয়ট্ সাহেবের ইতিহাসে ও আকবরনামায় এ সব কথা বেশ খুলে লেখা আছে। রাজা বীরহাম্বীর জগৎসিংহকে বিপন্ন দেখে তাঁ'র বিপদুদ্ধারের জন্য চেষ্টিত হ'লেন। তাঁ'কে কৌশলে তাঁ'র রাজধানী বিষ্ণুপুরে সরিয়ে নিয়ে নিরাপদ্ করলেন। এদিকে ঘোরতর যুদ্ধ বেঁধে উঠ্ল। রাজা বীর হাম্বীরও নিশ্চিন্ত রইলেন না—মোগল-সম্রাট্ আকবর বাদশার সেনাপতি মান-সিংহের সঙ্গে মিলে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কতুল খাঁকে পরাস্ত করলেন। তাঁ'র অসীম প্রতাপ নিয়ে তিনি যদি মানসিংহকে সাহায্য না করতেন তা' হ'লে সেবারকার সেই কতুলখাঁর যুদ্ধে মোগল-সেনাপতি রাজা মানসিংহ ও তাঁ'র ছেলে জগৎসিংহের যে কি দশা হ'ত কে জানে! রাজা বীর হাম্বীরের অসংখ্য সৈন্য ছিল। শুনা যায়, এমন কতকগুলো পালোয়ান ও শক্তিশালী-লাঠিয়াল ছিল যে তিনি তা'দের সাহায্যে করতেন লুঠ্তরাজ। শুধু রাজা বীর
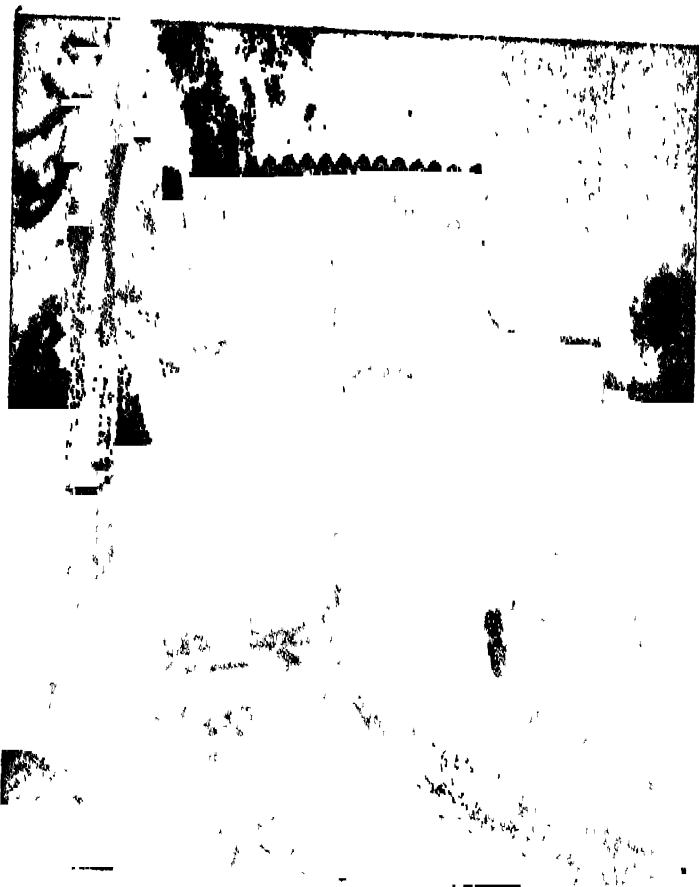
গড় দরজা।

হাম্বীর এ কায করিতেন তা' নয়—তখনকার অনেক রাজা রাজড়াই এতে কোন পাপ হয় বলে মনে করতেন না। এ ছিল তাঁ'দের একটা উপরি পাওনা। কেন বল্‌ছি শোন ঃ—

রাজা বীর হাম্বীর রাজত্ব করছেন—দুর্দ্দণ্ড তাঁ'র প্রতাপ। এমন সময় তাঁ'র রাজধানীর কাছ দিয়ে পরম বৈষ্ণব, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও ঠাকুর নরোত্তম দাস, বৃন্দাবন হ'তে নানা বৈষ্ণবগ্রন্থে কয়েকটা গোরুর গাড়ী বোঝাই করে গৌড়ে যাচ্ছিলেন। বৃন্দাবন থেকে বিষ্ণুপুর এসে তাঁ'রা বড্ড ক্লান্ত হ'য়ে পড়লেন, জায়গাটা ভাল দেখে তাঁ'রা সেইখানে গাড়ীগুলো থামিয়ে বিশ্রাম করতে লাগ্‌লেন। গাড়োয়ানেরা আর ঠাকুর মশাইরা যখন নিশ্চিতে ঘুমোচ্ছিলেন তখন রাজা বীর হাম্বীরের লুঠ্‌তরাজের লোকজনদের চোখে পড়ে গেল, তাঁ'দের গাড়ীগুলো। সেগুলো ভর্ত্তি ছিল মাল পত্রে—বেশ করে ছিল বাঁধা পুঁথি পত্র কি তৈজসপত্র, কি টাকা পয়সা, না ধনদৌলৎ তা'রা তা' ভাল করে বিবেচনা করবার সময় পেল না। তা'রা মনে করল, নিশ্চয়ই ও সব লুটের যোগ্য দামী দামী জিনিষ। হৈ হৈ, রৈ রৈ করে তা'রা লাঠি, সড়কী, বল্লম, ঢাল, তরোয়াল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সেই গাড়ী গুলোর উপরে। মুহূর্ত্তে সব লুঠ করে, তা'রা সেই বস্তাবন্দী মালপত্র নিয়ে সরে পড়্‌ল রাজ বাড়ীতে। তা'দের ডাক হাঁকে, ঠক্‌ ঠক্‌,

ঢক্ ঢক্ শব্দে—আর কোলাহলে গাড়োয়ানদের ঠাকুর মশাইদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখলেন—সব পুঁথিপত্র লুঠ করে নিয়ে ডাকাতরা ছুটে চলেছে। কষ্টে অনুসন্ধান করে তাঁ'রা জান্‌লেন—সে লোকগুলো সেখানকার রাজা বীর হাম্বীরের লোক।

মহাপণ্ডিত—বৈরাগী বৈষ্ণব মানুষ। পুঁথিগুলোর দাম তাঁ'দের কাছে তাঁ'দের প্রাণের চেয়েও ছিল বেশী। কি করবেন তাঁ'রা অনেক ভেবে চিন্তে শ্রীশ্রীগৌরহরির নাম স্মরণ করে, তাঁ'রা রাজা বীর হাম্বীরের রাজ সভায় গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। কি সুন্দর সে রাজসভা—ঐশ্বর্য্যে ভরা বিচিত্র!

সৌভাগ্যক্রমে তাঁ'রা অর্থাৎ পরম পণ্ডিত ও বিশ্ববিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীনিবাস এবং পরম ভাগবত শ্রীল শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, যখন রাজা বীর হাম্বীরের রাজসভায় প্রবেশ করলেন, তখন রাজা বীর হাম্বীরের সভা-পণ্ডিত মশাই পাঠ করছিলেন ভাগবত। সভা নীরব—নিস্তব্ধ। কাণপেতে সকলে শুন্‌ছিলেন সে পাঠ। এমন সময়—"গৌর গৌর" বলতে বলতে তাঁ'রা দু'জন সেই সভায় উপস্থিত হ'য়ে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন! সভার সকলে তাঁ'দের অপূর্ব্ব দৈন্যময় বৈষ্ণবমূর্ত্তি দেখে তাঁ'দের দিকে অবাক্-বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। তাঁ'দের দেহকান্তিতে সভা ঝল্‌মল্ করে উঠ্‌ল। সকলেরই মনে কি যেন কিসের ঝড় বইতে

লাগ্‌ল্। কপটী, পাষণ্ডের মনও এক নবভাবে আলোড়িত হ'তে থাক্‌ল। রাজা সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে আপনারা ?"

কি দৈন্যে ভরা তাঁ'দের সে আত্মপরিচয়! শ্রদ্ধাবনত শিরে রাজা তাঁ'দের অভ্যর্থনা করে, বসতে দিলেন। সভাপণ্ডিত পাঠ করতে থাকলেন—ভাগবত। অবসর বুঝে, আচার্য্য শ্রীনিবাস ঠাকুরও ব্যাখ্যায় যোগ দিলেন। তাঁ'র সে সুধামাখা ব্যাখ্যায় রাজা বীর হাম্বীরের রাজসভায় জোয়ার ব'য়ে গেল। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁ'র মনোরম ভঙ্গীতে বলেছেন ঃ—

"সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়া-কায়া ধরি।"

রাজা বীর হাম্বীরের কাছেও এসেছিল ভ্রান্তি, তা'র মায়াময় কায়া নিয়ে—রাজা সংসারে বদ্ধ হ'য়েছিলেন, লুঠ্‌তরাজ করতেও ইতস্ততঃ করছিলেন না; কিন্তু ভাগ্যবান্ তিনি—পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে দেখা পেলেন এমন দু'জনের—যাঁ'দের মুহূর্ত্ত সংস্পর্শে জন্মজন্মান্তরের সব পাপ ঝড়ের মুখে তূলোর মত উড়ে যায়।

"সত্য দেখা দিল—ভূষণ বিহীনরূপে
আলো করি, অন্তর বাহির।"

রাজা বীর হাম্বীর আর সে রাজা বীর হাম্বীর রইলেন না; তাঁ'র অন্তর বাহির আলো করে দেখা দিলেন গৌর-হরি, তাঁ'র সত্যিকার ভূষণ বিহীন—সরল, সহজ, মধুর, দিব্য কান্তি নিয়ে। রাজার বিষয়-বাসনা দূর হ'ল। জলের ...া তেল যেমন ভাসে তিনি তেমনই তাঁ'র সংসারে ভাসতে লাগলেন। তাঁ'র রত্নখচিত মুকুট নুয়ে পড়ল বৈষ্ণবাচার্য্য ...া ঠাকুরের অভয় পায়। তিনি তাঁ'র নিকট দীক্ষিত হ'লেন। মল্লভূমের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় দেখা দিল।

অহর্নিশ বৈষ্ণব-সঙ্গে, হরি-কথায় রাজা ডগমগ হ'য়ে উঠ্‌লেন। সর্ব্বপ্রকার ঔদ্ধত্য দূর হ'য়ে রাজা আর তাঁ'র রাজবাড়ার সকলে হ'য়ে পড়লেন তৃণের চেয়েও সু-নীচ, কোথায় গেল সে অহঙ্কার—অভিমান, কোথায় গেল সে স্বার্থপরতা, সাধুসঙ্গের এমনই গুণ! সত্যি সত্যি সাধু-সঙ্গ পরশমণি। স্পর্শ করবামাত্র লোহা যায় হ'য়ে সোনা।

শুনা যায়—রাজা বীর হাম্বীর বিষ্ণুপুরকে বৈষ্ণব রাজত্বে পরিণত ও পরিবর্ত্তিত করেছিলেন। তাঁ'র ভক্তি-গঙ্গায় যে জোয়ার বয়েছিল তা'র অবিরাম কলোচ্ছ্বাসে বিষ্ণুপুর রাজ্য এখনও মুখরিত হচ্ছে—আমোদিত ও নন্দিত হচ্ছে।

বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ তীর্থ বৃন্দাবন ধামের দর্শন ভিখারী হ'য়ে ছুটে চললেন সুদীনাত্মা রাজা বীর হাম্বীর। অপূর্ব্ব
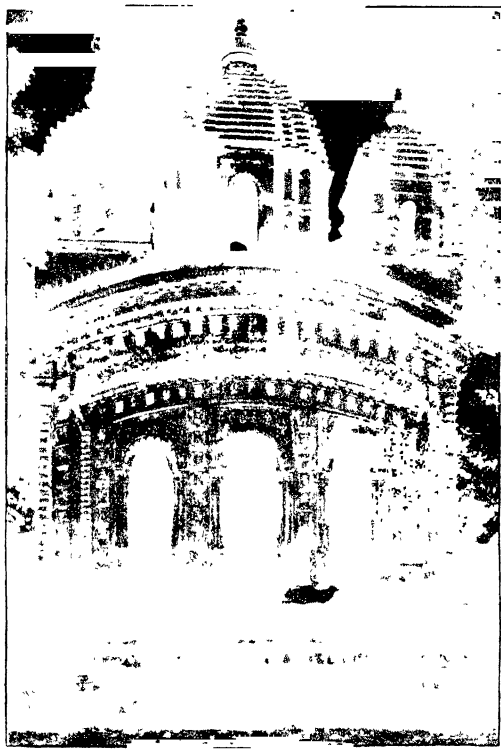
বাসুলী দেবীর মন্দির।

উ[illegible] তিনি বিভোর হ'য়ে গেলেন। রাত দিন—অষ্ট প্রহর—মুহুর্মুহু নামগান—বৈষ্ণব-সঙ্গ—বৈষ্ণব-সেবন করতে লাগ্‌লেন। তৃণাদপি সু-নীচ, তরুর মত সহিষ্ণু, অমানী হ'য়ে মান দান ব্রতে তিনি উন্মাদ হ'য়ে উঠ্‌লেন। বৃন্দাবন হ'তে জাগ্রৎ বিগ্রহ মদনমোহনকে বহু যত্নে এনে তিনি তাঁ'র রাজধানীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। সর্ব্বস্ব ঢেলে তাঁ'কে সাজা'লেন। সাক্ষাৎ প্রাণের ঠাকুরের মত পূজো অর্চ্চনা, ভোগরাগ, আরতির ব্যবস্থা করলেন।

যে রাজা বীর হাম্বীর একান্ত সংসারাসক্ত, সংসারের জন্য হিতাহিত, কর্ম্মাকর্ম্ম, পুণ্যাপুণ্যবোধবিবর্জ্জিত হ'য়েছিলেন, তাঁ'রই হ'ল এই দশা। কোথায় রইল তাঁ'র সেই অপূর্ব্ব যুদ্ধ কৌশল, কোথায় রইল তাঁ'র অপূর্ব্ব শোভাময় নানা শিল্পকার্য্য বিমণ্ডিত রাজপ্রাসাদ—রাজধানী, তিনি মজে গেলেন ভ্রমরের মত শ্রীহরির পদারবিন্দ-সুধায়।

বৃন্দাবন থেকে বহু কষ্টে—শূন্য প্রাণে রাজধানীতে ফিরে এসে রাজা বীর হাম্বীর—তাঁ'র রাজধানীতে অহর্নিশ বৃন্দাবন লীলা দর্শনের জন্য একান্ত আকুল হ'য়ে রাতদিন চোখে পড়ে এমন সব জায়গায় নিজের মনের খোরাক ও প্রজাদের হিতকল্পে—ধর্ম্মভাব বৃদ্ধির নিমিত্ত "যমুনা", "কালিন্দী", "শ্যামকুণ্ড", "রাধাকুণ্ড" প্রভৃতি বাঁধ বেঁধে দিলেন। প্রিয়তম বৈষ্ণব ধর্ম্মের সুপ্রচারের জন্য অষ্টপ্রহর নানাভাবে

নানা প্রণালীতে চেষ্টা করতে থাকলেন। সর্ব্বত্র মৃদঙ্গ, করতালের ধ্বনি, নামকীর্ত্তন ও মহামহোৎসব হ'তে লাগল। নামে রুচির জন্য তাঁ'র অক্লান্ত চেষ্টায় বিষ্ণুপুর রাজ্য তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠ্‌ল।

তাঁ'র প্রতিষ্ঠিত জাগ্রৎ শ্রীশ্রীমদনমোহন মহা বিগ্রহ সুদীর্ঘকাল তাঁ'র রাজ্যকে নিরাপদ্‌ ও সর্ব্ব সুখ-ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করে রাখলেন।

তাঁ'র বিষ্ণুপুরের মন্দির এখনও চোখ জুড়িয়ে দেয়। ছাঁচে ঢালা ইটে খোদা, পাথরে গাঁথা সে সব মন্দির। পাথরগুলোর আকার এক এক বর্গ ইঞ্চ্‌ হ'তে এক এক বর্গ গজ। মন্দিরে মন্দিরে খোদা রয়েছে, দশ অবতারের কত মূর্ত্তি—কৃষ্ণ-লীলা, রাস-লীলা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতের কত সব লীলা! বিষ্ণুপুর সঙ্গীতে ভারতের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিল। এখনও সেখানকার গাইয়ে, বাজাইয়ের তুলনা নেই। সে রাজ্য এখনও পরম বৈষ্ণব রাজা বীর হাম্বীরের অমর অবদানের কথা উদাত্ত সুরে ঘোষণা করছে।

বৈষ্ণবোত্তম রাজা বীর হাম্বীর দেহ রক্ষা করবার পর যাঁ'রা রাজা হ'য়েছিলেন, তাঁ'দের মধ্যে রাজা দামোদর অবস্থা-বৈগুণ্যে তাঁদের পরমারাধ্য কুল-দেবতা ৺মদনমোহন জীউকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করতে বাধ্য হন। কল্‌কাতার

বাগ্‌বাজারের সুবিখ্যাত ধনী গোকুল মিত্র মশাই সেই বিগ্রহ তিন লাখ টাকায় কিনে এনে কল্‌কাতায় তাঁ'র বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই হ'তেই তাঁ'র সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়—বিষ্ণুপুরের হ'তে থাকে অধঃপতন। এখনও রাজা বীর হাম্বীরের সেই প্রাণের জাগ্রৎ ঠাকুর বাগবাজারে রয়েছেন।

মল্লভূমের এই পরমবৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ রাজা—ভূঁইয়া-কুলোত্তম বীর হাম্বীরের কনিষ্ঠ পুত্র বঙ্কু রায়ের নামানুসারেই বাঁকুড়া বা বাকুণ্ডা সহরের নাম হয়েছে। পরম বৈষ্ণব রাজা বীর হাম্বীরের সেই বৈষ্ণব রাজ্য বিষ্ণুপুর তাঁ'র অজস্র বৈষ্ণব-স্মৃতি নিয়ে বাঙ্গালী বৈষ্ণবের চিত্ত জুড়া'তে এখনও রয়েছে—সেই কেবল সেই পরম বৈষ্ণব রাজা বীর হাম্বীর!

—অষ্টম অধ্যায়—

"বায়ু বহে আপনার মনে
প্রভঞ্জন করিছে গঠন
ক্ষণে গড়ে, ভাঙ্গে আর ক্ষণে
কত মত সত্য অসম্ভব
জড় জীব বর্ণ, রূপ ভাব!"

—স্বামী বিবেকানন্দ—

—চাঁদগাজি—

মহাভারতে লেখা আছে শিশুপাল ছিলেন ভারী দুর্দ্দান্ত রাজা। তাঁ'র প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। যে বংশে তিনি জন্মেছিলেন তা'র নাম ছিল চেদিবংশ। ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণা এই চেদি বংশীয় রাজাদের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

পরে এই পরগণা কামরূপ রাজ্যের অধীন হয়। কিন্তু বাংলা দেশে পাল-রাজগণ রাজা হ'লে তাঁ'রা এ রাজ্য বহু র'ণ করে—যুদ্ধ করে, তাঁ'দের অধিকারভুক্ত করেন, সেই হ'তে ভাওয়ালের একটা নামই হয়ে যায় "রণভাওয়াল"। "কাপাসিয়া" বলে যে জায়গা এখনও আছে সেখানে আজও রাজা শিশুপালের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ

দেখা যায়। সাভারের নিকট রাজা হরিশচন্দ্র পালের আর তেলিয়াবাদে যশোপালের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও দাঁড়িয়ে থেকে তাঁ'দের মহিমার সাক্ষ্য দান করছে। পাল রাজাদের সে সময়ে যথেষ্ট প্রতাপ ছিল—সৈন্য সামন্তেরও অন্ত ছিল না।

কিন্তু বিধিনির্ব্বন্ধ লঙ্ঘন করবে কে? তাঁ'দের সময়ে একদল মোসলমান হ'য়ে উঠলেন ধর্ম্মের নামে উন্মত্ত। তাঁ'রা তাঁ'দের ধর্ম্মপ্রচার করে, অন্য জাতীয়দেরে স্বীয় জাতিতে পরিণত করে, পাগলের মত ছুটে বেড়া'তে লাগলেন। তাঁ'দের ছিল অনেক লোক, অনেক অস্ত্রশস্ত্র, তা' ছাড়া দিল্লীর বাদশা দিতে লাগলেন তাঁ'দের মহা উৎসাহ। হিন্দুগণের সঙ্গেই হ'ল বেশীর ভাগ যুদ্ধ আর যত শত্ত গোলমাল। গৌড়ের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ এই অস্ত্রধারী ধর্ম্মোন্মাদ-গণ অধিকার করে বসলেন। এঁদের নেতা যিনি ছিলেন তাঁ'র নাম ছিল পালোয়ান গাজি। গাজি শব্দের অর্থ বীর। বীর পালোয়ান গাজি ধর্ম্মোন্মত্ত অনুচরগণের সহায়তায় অচিরে মস্ত বড় এক রাজ্যের সৃষ্টি করলেন। তাঁ'র বংশীয়েরাই হ'লেন পরে গাজি বংশ বলে বিখ্যাত।

কথিত আছে, এই পালোয়ান গাজির পুত্র ভাওয়াল গাজি সাহেব নিজ ক্ষমতায় তদানীন্তন দিল্লীর সম্রাটের নিকট হ'তে জায়গীর প্রাপ্ত হন। তাঁ'রই নামানুসারে "ভাওয়াল

পরগণা” নামের সৃষ্টি হয়। তৎকালে বুড়ীগঙ্গার তীর হ'তে গারো পাহাড়ের পাদদেশ অবধি অরণ্য স্থানের সবটাই ভাওয়াল নামে কীর্ত্তিত হ'ত। চৈরা নামক গ্রামে ছিল তাঁ'দের রাজধানী। তাঁ'দের সম্ভ্রমের অবধি ছিল না। ঢাকা জেলার কয়েকটী পরগণার শাসনভার, এই গাজি-বংশের শাসনকর্ত্তাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল।

বারভুঁইয়াদের অন্যতম এই ভাওয়ালের নিকটবর্তী চাঁদপ্রতাপের চাঁদ গাজি সাহেব স্বাধীন ছিলেন। নামে মাত্র মোগল সম্রাটের অধীন হ'লেও কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করতেন। জীবিত কালাবধি অন্যান্য ভুঁইয়াদের ন্যায় ইঁহারও প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁ'রই নামানুযায়ী পরগণার নাম চাঁদপ্রতাপ হয়। ভাওয়ালে এঁদের দুই ভাইয়ের নামে দু'টী পরগণার সৃষ্টি হ'য়ে অদ্যাবধি বিদ্যমান্ আছে। এক ভাই—সেলিমের নামানুসারে যে পরগণা হয় তা'র নাম হয় সেলিম প্রতাপ। অপর ভাই—সুলতানের নামানুসারে হয় সুলতানপ্রতাপ পরগণা। ভাওয়াল পরগণার সদর খাজানার কথা ভাবিলেই বুঝা যায় যে রাজ্যটী ছিল কত বড়। মোটা-মোটি সদর খাজানার পরিমাণ হচ্ছে ৪৮,৩০০৲ টাকা।

খিজিরপুরের বিখ্যাত ভুঁইয়া ঈশা খাঁ ও বিক্রমপুরের কেদার রায় সুদীর্ঘকাল তাঁ'দের স্বাধীনতার জন্য মোগল

জোড় বাংলা—(১৬৬৫ খৃঃ)

সম্রাটের সঙ্গে সংগ্রাম করেন। তাঁ'দেরই পার্শ্ববর্ত্তী এই চাঁদগাজি সাহেবও তাঁ'দের মতানুবর্ত্তনী হ'য়ে তাঁ'দের সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন। সম্রাট্ আরঙ্গজীবের রাজত্ব কালাবধি এই গাজিবংশের আধিপত্য প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল বললেই চলে।

দুর্ভাগ্যচক্রে গাজি বংশধরগণ হয়ে পড়েন বিলাসী, চরিত্রহীন। খাঁটি মোসলমানদের বংশের এই পাপ ভগবান্ সইলেন না। যাঁ'রা তাঁ'দের কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁ'রা হুজুরদের এই ক্রুটী তীব্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন, সুযোগ এসে ধরা দিল। বলরামপুর, গাছা, পালাসনা প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষেরাই ছিলেন এই গাজি সাহেবদের কর্ম্মচারী, তাঁ'রা হ'লেন এক একজন জমিদার।

সুলতান গাজি সাহেবের যখন চৈতন্য হ'ল তখন আর কিচ্ছু নেই। এখন গাজীবংশ হৃতগৌরব। বল্‌বার জন্য রয়েছে কেবল তাঁদের পোড়া স্মৃতি।

—নবম অধ্যায়—

"সুচির বসন্ত, হাসে না ধরায়।
না চির হেমন্ত ধরণী কাঁপায়।
উত্তপ্ত নিদাঘ প্রাবৃটে জুড়ায়।
অনিত্য সকলি বিধির ইচ্ছায়।

—হেমচন্দ্র

—ফজল গাজি—

দরবেশ পালওয়ান গাজির এক ছেলে ছিলেন তাঁ'র নাম ছিল কায়াম খাঁ গাজি। কায়াম খাঁ গাজি ভারী বুদ্ধিমান্ ও শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন, তিনি নিজ কৃতিত্বে দিল্লীর বাদশার অনুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। ভাওয়াল পরগণার কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি এই ভাওয়াল পরগণায় অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

এই কায়াম খাঁর পরবর্ত্তী সপ্তম পুরুষ ছিলেন বাহাদুর গাজি। তিনিও বীর ছিলেন। অনেক যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁ'র মৃত্যুর পর তাঁ'র কোন সন্তান না থাকায় তাঁ'র ভাই মাতাব গাজি পরিত্যক্ত সিংহাসন অধিকার করেন।

এই মাতাব গাজির ছেলের নামই বিখ্যাত ফজল গাজি।

এক দিকে যেমন চাঁদ গাজি ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনতা-লিপ্সু, বীর, অন্যদিকে তাঁ'রই বংশেরই অন্য শাখার এই ফজল গাজিও নিয়ত তাঁ'রই মত সম্মান ও স্পর্দ্ধার সহিত চলতেন। উভয়েই স্বাধীনতার জন্য আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়, সে যুগে এই গাজিকুলতিলকদ্বয় বারভূঁইয়ার অন্যতম ভূঁইয়া রূপে কি অসাধারণ ক্লেশ স্বীকারই না করে গেছেন!

গাজিগণের পূর্ব্বপুষগণ নিজ ধর্ম্ম ও আনুষঙ্গিক রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রথম প্রথম হিন্দুদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ, নানা মনোমালিন্য সংঘটন করলেও ক্রমে তাঁ'দের প্রতিবেশী, তাঁ'দের সুখ দুঃখের অংশভাগী হ'য়ে পড়েন। তাঁ'দের সে ধর্ম্মোন্মত্ততা আর স্থির ছিল না। তাঁ'রা প্রজানুরঞ্জক, সমদর্শী হ'য়ে উঠেন। সম্রাট্ আকবর, ও তাঁ'দের নিযুক্ত প্রতিনিধি নবাবগণের স্পর্দ্ধা তাঁ'রা সহ্য করেন নি। যখনই সুযোগ ও সুবিধা পেয়েছেন, তখনই অন্যায়ের প্রতিকার, ক'রতে পাশ্চাৎপদ হন নি।

ফজল গাজি, চাঁদ গাজি সত্যিই বীর ছিলেন। উন্নতির জন্য আমরণ সংগ্রাম করে বারভূঁইয়াদের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। তাঁ'দের সহায়তা ব্যতীত ঈশা খাঁ, কেদার রায় ওরূপ স্পর্দ্ধার সঙ্গে মোগলবাহিনীকে পর্য্যদস্ত করতে সমর্থ হ'তেন না।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায়, তাঁ'দের বংশধরগণ বিবিধ বিলাস ব্যসনে আসক্ত হ'য়ে উঠেন। ক্রমে তাঁ'দেরই বংশধর দৌলত গাজী সাহেব নবাবের অত্যন্ত অধীন হ'য়ে পড়েন, বন্দোবস্তী রাজস্ব সঙ্কুলনও তাঁ'র অসাধ্য হয়। ঢাকার তদানীন্তন নবাব তাঁ'র জমিদারী বাজেয়াপ্ত করেন, মুর্শিদাবাদে এর জন্য তিনি দরবার পর্য্যন্ত করতে যান। বর্ত্তমান ভাওয়াল রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ কুশধ্বজ রায় মহাশয়, তখনকার নিজামত আদালতে অনেক পরিশ্রম করে ফিরিয়ে আনেন গাজি সাহেবের সম্পত্তি। কুশধ্বজ রায় গাজি সাহেবের মন্ত্রী হন। ক্রমে গাজি সাহেবের অকর্ম্মণ্যতার সুযোগে নিজেই জমিদার হয়ে বসেন।

—দশম অধ্যায়—

—ঈশা খাঁ—

"দৈবায়ত্ত কুলে জন্মঃ
মমায়ত্তং হি পৌরুষম্ ॥"

অযোধ্যা বা আউধ হ'তে বাংলা দেশে ব্যবসায় করতে এলেন কালিদাস গজদানী নামে একজন ক্ষত্রিয় রাজপুত—ব্যবসায় বাণিজ্য করতেন বলে অনেকে তাঁকে বৈশ্য বলে বলেছেন। যা' হ'ক্ কি হ'বে জাত বিচার দিয়ে?

সত্যি, বড় কুলে ভাল বংশে জন্মান বিধাতার হাত। কিন্তু মানুষ চেষ্টা ক'রলে বড় হ'তে পারে, বীর হ'তে পারে, ধনী হ'তে পারে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। দৈববাদীরা এতেও অবশ্য দৈবের হাত দেখা'তে ছাড়বেন না কিন্তু মোটামোটি মীমাংসা হচ্ছে দৈব ও পুরুষকার দুইয়েরই দরকার, ঘুমন্ত সিংহের মুখে আপনি এসে হরিণ ঝাঁপিয়ে পড়ে না—পড়লেও সে হচ্ছে একটা ব্যতিক্রম। যাঁ'রা অজগরের মত হাঁ করে পড়ে থেকে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে সাহস পান তাঁ'দের সঙ্গে একমত হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

কালিদাস গজদানী মহাশয় সুদূর অযোধ্যা দেশ থেকে, সেই রেল ষ্টীমার, মোটর, লরী, লঞ্চ শূন্য দিনে, বহুকষ্টে ঢাকা অঞ্চলে গিয়ে ব্যবসায় বাণিজ্য সুরু করলেন, অসাধারণ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা না থাকলে, আমাদের ন্যায় বাড়ীমুখো বাঙ্গালীর মত হ'লে হয়ত তিনি দেশে "আঁটার রুটি আর ঘিউ খেয়েই" জীবন কাটা'তেন, তিনি যে সে প্রকৃতির ছিলেন না—এ তাঁ'র এই সুদূর অভিযানেই সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জের প্রায় এক মাইল উত্তরে ছিল খিজিরপুর বলে একখানি গ্রাম, এখানে এসে ব্যবসায়ী কালিদাস গজদানী মহাশয় তাঁর ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ব্যবসায়ে চলছিলও মন্দ নয়—কিন্তু তিনি দেখলেন বাংলার উর্ব্বরা ভূমিও বাণিজ্যের চেয়ে কম লাভজনক নয়।

তখন দেশে চোর ডাকাতের তত ভয় ছিল না, রাজধানী দিল্লীও বহুদূরে। রাজার উপদ্রবও তত বেশী নেই। তা'ই তিনি বুদ্ধি খাটিয়ে সোনারগাঁয়ের কাছে সামান্য সামান্য কিছু জমি কিন্‌লেন—কিনে তা'তে স্বাধীন ভাবে বসবাস সুরু করে দিলেন, তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন—সোনার হাতী দান করতেন বলে গজদানী নামে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেন।

যে জমি কিনলেন, তা' অনেক নয়—কিন্তু তাঁ'র হৃদয়

ছিল মস্ত বড়—বহু আশায় ভরা। স্বাধীন ভাবে থাকবেন এই ছিল তাঁ'র আকাঙ্ক্ষা, জমিগুলি ছিল খাজনাকরা—কিন্তু খাজনা দেওয়ার মত মনোবৃত্তি তাঁ'র ছিল না। তিনি "আবার খাজনা দেব কা'কে ?" এমনই একটা দুর্দ্ধর্যভাব মনে মনে পোষণ করতেন। সে কি চলে ?

কিন্তু এক এক সময়ে এক একটা লোক, এক এক জায়গায় জন্মে যাঁ'রা অসম্ভব সম্ভব করে তোলেন—দম্ভভরে বলেন—"অসম্ভব কথাটা অভিধান হ'তে উঠিয়ে দেও—সে কি গো ? মানুষের কাছে আবার অসম্ভব কি ?"

এমন লোকের কথা, অনেক ইতিহাস খুঁজে দেখেছি, ঐতিহাসিকগণ উল্লেখও করেন নি—করবেনই বা কেন ? তাঁ'রা উল্লেখ করেন, যাঁ'রা গতানুগতিক, প্রকারান্তরে কাপুরুষ রাজভক্ত বলে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁ'দের কথা। বাঙ্গালীর লিখিত কোন ইতিহাসে কালীদাস গজদানীর তেমন উল্লেখ নেই। এমন কি তাঁ'র ছেলে মহাবীর ঈশা খাঁর কথাও নয়।

সুলতানের লোক খাজনা চাইতে এলে তিনি তাঁ'দের বার বার হাকিয়ে দিতেন। ক্রমে এক, দুই করে বহুবার তিনি তাঁ'দেরে এই ভাবে অপমানিত করলেন, খাজনাও বাকী হ'ল অনেক, হিসাবের সময় কথাটা শাহানশাহের কানের বেশ অতিরঞ্জিত হ'য়েই উঠ্‌ল।

শাহানশাহ চটে লাল হ'লেন। তিনি হুকুম দিলেন—সেনাপতিকে!

সেনাপতি বেছে বেছে তাঁ'র সহকারীদের সৈন্যসামন্ত দিয়ে পাঠা'লেন। দু' চা'র বার যুদ্ধ হ'ল। বাদশাহের সৈন্যেরা পরাস্ত হ'য়ে ফিরে গেল।

দরবারে যুক্তি করে, ঠিক্ করা হ'ল, বিরাট আয়োজন কর, যত সৈন্য, যত গোলা, যত বারুদ লাগে নিয়ে গিয়ে বেটাকে এখুনি জাহান্নমে দাও।

একে একে বড় বড় সেনাপতি—সোলেম খাঁ, তাজ খাঁ, দুবিবার খাঁ সোনার গায়ে গেলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য গজদানী পরাস্ত হলেন না, শেষে সন্ধি করতে হ'ল।

কিন্তু সন্ধি ত একটা কৌশল মাত্র। গজদানী সন্ধি মান্‌বার পাত্র ছিলেন না। হঠাৎ একদিন প্রভাতে—অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল।

সংবাদ পহুঁছিতে বিলম্ব হ'ল না—গজদানী আবার বিদ্রোহী হয়েছেন। এবার গজদানী বেশ ভাল ভাবেই বিদ্রোহ সুরু করলেন। দূরদেশে থাকেন সুলতান—তিনি তাঁ'র কি করবেন এই হ'ল তাঁ'র দৃঢ় বিশ্বাস।

কিন্তু সুলতানের তা' সহ্য করবার মত হৃদয় ছিল না। শত্রুকে তিনি মোটেই উপেক্ষা করতেন না।

অসংখ্য সৈন্য পাঠিয়ে গজদানীর সর্ব্বনাশ করতে তিনি উদ্যত হ'লেন। প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতি এবার নির্দ্দয় ভাবে গজদানীকে আক্রমণ করলেন। সে আক্রমণ গজদানী সহ্য করতে পারলেন না, সুলতানের হুকুম ছিল—জন বাচ্চা শুদ্ধ গজদানীকে একেবারে উৎসন্ন করার, তা'ই হ'ল, গজদানীকে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে, তাঁ'কে নির্ম্মমভাবে তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে নিহত করা হ'ল।

শুধু তা'ই নয়। তাঁ'র বংশের কেউ যদি বাংলায় থাকে তা'হ'লে হয়ত সে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে। এইজন্য তাঁ'র ছেলে ঈশা খাঁ ও ইসমাইল খাঁকে প্রাণে না মেরে, ভারতের বাইরের তুরাণ দেশের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করে ফেলা হ'ল। সুলতান ভাবলেন বিষবৃক্ষের মুলোচ্ছেদ হ'ল! কিন্তু বিধাতা একটা মায়ার খেলা খেললেন। স্বাধীন রাজার ছেলেরা হ'লেন ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত। ক্রেতার সঙ্গে অবশ্য খুব আঁটাআঁটি বন্দোবস্ত হ'ল যে কিছুতেই যেন তাঁ'রা বাংলাদেশে না আসতে পারে।

রাজার ছেলে ক্রীতদাস হ'য়ে দেশ ছেড়ে, মা ছেড়ে, বাড়ী ঘর, খেলার সঙ্গী, সব ছেড়ে তুরাণদের গৃহে অতি কষ্টে দিন কাটা'তে লাগলেন। সবই ভগবানের ইচ্ছা! বিপদ, সম্পদের অগ্রদূত এও ত ঠিক!

তাঁ'দের সহায় হ'লেন, তাঁ'দের স্নেহময়, সদাশয় পিতৃব্যদেব কুতব খাঁ।

বল্‌তে একটু গোল হয়েছে। কালিদাস গজদানী মহাশয়, কেন তা' জানা যায়নি, স্বধর্ম্ম ছেড়ে, মোসলমান হয়েছিলেন। তাঁ'র সঙ্গে সঙ্গে তাঁ'র পরিবারের সকলেই যে মোসলমান হয়েছিলেন, তা' বলাই বাহুল্য। জমিদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এ কর্ম্ম করেছিলেন, মোসলমান হ'য়ে তাঁর নাম হয়েছিল স্থলেমান্। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, কালীদাস গজদানী বা স্থলেমান সাহেব যখন বারংবার খাজনা বন্ধ করে বিদ্রোহী হচ্ছিলেন তখন দিল্লীর স্থলতান ছিলেন স্থলতান শের শার পুত্র ইসলাম শা। ইনি ছিলেন পাঠান। এঁর সৈন্যেরাই স্থলেমানকে পরাজিত, বন্দী ও নিহত করে এবং তাঁ'র ছেলে ঈশা খাঁ ও ইসমাইল খাঁকে বিক্রয় করে ফেলেন।

এই সময়ে স্থলেমানের ভ্রাতা কুতব খাঁ নানা কৌশলে ভাইয়ের রাজত্ব রক্ষা করছিলেন। শাসনকর্ত্তা ছিলেন সেলিম খাঁ বলে একজন। তিনি বড় নির্ম্মম ছিলেন। তাঁ'র আমলে কুতব খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের জন্য কোন চেষ্টাই সফল হয় নি। তাঁ'র মৃত্যুর পর, তাজ খাঁ বলে এক-জন শাসন কর্ত্তা বাংলায় এলেন। ইনি এসে দেখলেন,

সুলেমানের মত কুতব খাঁ বিদ্রোহভাবাপন্ন ন'ন্। দেশে নানা সৎকার্য্য করেছেন, তাঁ'র সদ্ব্যবহারে সকল লোকই তাঁ'র উপর ভারী খুসী। অযথা হাঙ্গামায় ফল নেই ভেবে তাজ খাঁ তাঁ'র সঙ্গে কোন অসদ্ব্যবহার করা সঙ্গত বোধ করলেন না, বরং মিত্রভাবে, সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁ'র কথা মতই চলতে লাগলেন।

কুতব সাহেবের কোন সন্তান ছিল না। ভাইয়ের ছেলেদের উপর ভারী টান ছিল। তিনি অনেক বলে কয়ে, বহু চেষ্টায় নিজের দায়িত্বে তাঁ'র ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে ফিরিয়ে আনলেন। বহুদিনে, বহু কষ্টে তাঁ'র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'ল।

ঈশা খাঁ ও ইসমাইল খাঁ পুনরায় সোনারগাঁয় আনীত হ'লেন। পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের আনন্দের আর সীমা রইল না।

ঈশা খাঁ তখন বড় হয়েছেন। বেশ শান্ত, শিষ্ট ও বুদ্ধিমান্ হ'য়েছেন। দুঃখে যাঁ'দের গড়ে উঠে জীবন, অনেক সময় দেখা যায় তাঁ'রাই বড় মানুষ হন।

অল্প দিন মধ্যে ঈশা খাঁর গুণে সকলে মুগ্ধ হ'লেন। তাঁ'র পিতৃব্য কুতব খাঁরও তখন বয়স হয়েছিল। তিনি উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে রাজ্য সপে দিয়ে নিশ্চিন্তে খোদার নাম করতে লাগলেন।

কতকদিন বেশ চল্‌ল। যুদ্ধ নেই, বিগ্রহ নেই, খান্, দান্, ভয় নেই, ভাবনা নেই। কিন্তু ঈশা খাঁ ত অমন থাকতে পারেন না!

"কে বাদশা?—তাঁ'কে কেন আবার খাজনা দিতে হ'বে?" এমনই এক বংশানুক্রমিকভাবে তিনি উন্মনা হ'য়ে উঠ্‌লেন। "না—না, এতগুলো টাকা খাজনা দিতে যা'ব কেন। দেখাই যা'ক্ না, না দিলে কি হয়" এই ভাবে তিনি বিব্রত—বিভোর হ'লেন। খাজনা দেওয়া বন্ধ হ'ল। বাদশার সৈন্য এল, ঈশা খাঁ তা'দের তাড়িয়ে দিলেন। একবার নয়, তু'বার নয়—বহুবার হ'ল এ কাণ্ড! ঈশা খাঁর পরাজয়, সে ত একটা মজার কথা—সন্ধি করে—বাদশার অধীনতা স্বীকার করে, তাঁ'কে আর তাঁ'র সেনাপতি ও লোকজন, সৈন্য সামন্তকে খুসী করে, তিনি খাজনা দিয়ে দিতেন, আবার সুযোগ পেলেই বন্ধ করতেন। যখন যে ভাবে চলে—তা'ই। আর যেবার তিনি জয়লাভ করতেন, সেবার যে কি হ'ত তা'ত সহজেই বুঝা যায়—বাদশার কর্ম্মচারীরা যে খালি হাতেই ফিরে যেতেন তা'তে আর সন্দেহ নেই।

রাজনৈতিক চাল—ঈশা খাঁ বেশ ভাল করেই চালা'তেন। দেখতে তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন,

বীরত্বের চিহ্ন তাঁ'র দেহে ফুটে বের হ'ত। তিনি বহু-গুণে গুণবানও ছিলেন! কাহারও কাহারও মতে বারজন ভৌমিকের মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ ভৌমিক।

কয়েকজন ঐতিহাসিক বলেছেন :—ঈশা খাঁ প্রথমে বাঙ্গলার স্বাধীন স্থলতান দায়ুদ শার সেনাপতি হ'য়েছিলেন। দায়ুদ শার পর নিজ বাহুবলে ও বুদ্ধি কৌশলে বাংলার একজন পরাক্রান্ত জমিদার বা ভৌমিক হ'য়ে উঠেন। ক্রমশঃ ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা অঞ্চলে জমিদারী বাড়িয়ে, ফৌজ ও রণপোত গড়া'য়ে, নারায়ণগঞ্জের নিকট সোনার গাঁ পরগণার খিজিরপুরে দুর্গ ও রাজধানী সংস্থাপন করে স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করতে থাকেন। দিল্লীর বাদশাকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেন।

সে যা'হ'ক, ঈশা খাঁর বুদ্ধি ও বল প্রভাবে বাদশাকে যে অত্যন্ত বিভ্রাটে পড়তে হয়েছিল তা'তে আর সন্দেহ নেই। ঈশা খাঁর পুনঃ পুনঃ অবাধ্যতায় বাদশা অধীর হ'য়ে উঠ্লেন। বাদশার সেনাপতিদের মধ্যে সাহাবাজ খাঁ ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী ও বুদ্ধিমান্। এবার তাঁ'কেই ঈশা খাঁকে দমন করতে পাঠান হ'ল। বিপুল সৈন্য নিয়ে সাহাবাজ খাঁ সহসা ঈশা খাঁকে আক্রমণ করলেন। ঈশা খাঁ এমন সাঙ্ঘাতিক আক্রমণের প্রত্যাশা

করেননি। প্রতিরোধ করবার কোন উপায় না পেয়ে, তিনি সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠা'লেন। কিন্তু সাহাবাজ খাঁও ঈশা খাঁর চেয়ে কম ধূর্ত্ত ছিলেন না—তিনি তাঁ'র মৎলব বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁ'র প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার সঙ্গে সঙ্গেই খিজিরপুর আক্রমণ করলেন। ঈশা খাঁ ভাবছিলেন, অন্যান্য বারের মত এবারও বুঝি কর্ত্তৃপক্ষ টক্ করে তাঁ'র সন্ধির প্রস্তাবে বাধ্য হ'বেন, কিন্তু তা' হ'ল না। সাহাবাজ খাঁর অতর্কিত প্রবলাক্রমণে ঈশা খাঁ একেবারে দিশেহারা হ'য়ে পড়লেন। পলায়ন ভিন্ন আর গত্যান্তর রইল না।

মোগল-সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ অনায়াসে খিজিরপুর দুর্গ অধিকার করলেন। দুর্গ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই ঈশা খাঁর অধীন, খিজিরপুরের নিকটবর্ত্তী পম্পা নদীর পর-পারের বর্ত্তমান তপ্পা নামক পরগণা, যা' তখন বাজুহারের অন্তর্গত ছিল, সেখানকার অস্ত্রাগারে ও মস্বাদি গ্রামের ধনাগার ও রসদাগার অধিকার করলেন।

ঈশা খাঁর এ অত্যাচার সহ্য হ'ল না। তিনি বাংলায় নিশ্চিন্ত থাকলেন না। অনেক সৈন্য, অস্ত্র ও রসদ গোপনে গোপনে সংগ্রহ করলেন।

সেনাপতি সাহাবাজ খাঁর কাণে এ সংবাদ গেল, তিনি ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ "তোটক" নগরে দুর্গ নির্ম্মাণ

করে তাঁ'র শত্রুদের গতি বিধি লক্ষ্য করতে থাকলেন ; কুমার সনন্দের পরপারে ছিল এ স্থান।

সাহাবাজ খাঁর অধীনে তারসুন বলে একজন অত্যন্ত সাহসী সেনাপতি ছিলেন, তিনি তাঁকে ভাওয়ালের পথে তোটক হ'তে বজরাপুর পাঠা'লেন বজরাপুরে ঈশা খাঁর সৈন্যেরা তাঁর বন্ধু মাসুম কাবুলীর নেতৃত্বে একত্র হয়েছিল।

তারসুন মহাবীরের মত যুদ্ধ করলেও পরাস্ত হ'য়ে বন্দী হ'লেন, তাঁ'কে বধ করা হ'ল।

সেনাপতি তারসুনের অলৌকিক বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও প্রভুভক্তির কথা সাহাবাজ খাঁর কর্ণ গোচর হইবা মাত্র তিনি মাসুম কাবুলীর এই অত্যাচারীর প্রতি শোধ নেবার জন্য ব্রহ্মপুত্রের শাখা পণার নদীর তীরেহ'তে ছুটে চললেন।

বর্ষার জল বেড়েছিল না, মোগলদের সুবিধা হ'ল, তা'রা নদীর ধারে বাসের সুযোগ পেল।

ঈশা খাঁ সব শুনলেন। তাঁ'র চতুরতার সীমা ছিল না। তিনি তাঁ'র অদ্ভুত বুদ্ধি প্রয়োগ করলেন, তাঁ'র পাঠান সৈন্যগণ ব্রহ্মপুত্র হ'তে ১৫টা খাল কেটে বর্ষার জল সেই সকল খাল দিয়ে দিয়ে মোগল শিবিরের দিকে চালিয়ে দিল। জল ছুটে চল্‌ল কল্ কল্ করে।

ঈশা খাঁ সম্মুখ যুদ্ধে এলেন না। নদী-নালার গোলক ধাঁধাঁয় মোগল সৈন্য ও সেনাপতিকে হতবুদ্ধি

করে তুললেন। খালগুলি এমন চমৎকার কৌশলে কাটা হয়েছিল যে সেগুলি দিয়ে নদীর বাণের জল চালিয়ে সব ভাসিয়ে দিতে লাগলেন। মোগল-সৈন্য সে জলে হাবুডুবু খেতে লাগ্‌ল। প্রবল জল-স্রোতে মোগলের তাঁবু ডুবে গেল—রসদ ভিজে গেল, বন্দুক, তলোয়ার সব ভেসে গেল, তা'রপর পাঠা'লেন সেই জল-প্লাবনের মতই পাঠান-সৈন্যের প্লাবন। মোগলেরা বড় বিপদে পড়লেন।

এমন সময়,—হরিণগুলো যেমন শিকারীর ভয়ে দৌড়া'তে দৌড়া'তে যখন আর পথ পায় না—ফিরে দাঁড়ায় ঘেরুয়া হ'য়ে শিকারীকে প্রাণপণ আক্রমণ করে তেমনই মোগল সৈন্যদের আর প্রাণের আশা নেই ভেবে একজন সুদক্ষ গোলন্দাজ তাঁ'র হাতের বন্দুকটী তুলে ধরে পাঠান সেনাপতির মস্তক লক্ষ্য করে অতি কষ্টে নিক্ষেপ করলেন। অব্যর্থ সে লক্ষ্য, পাঠান সেনাপতি সেই গুলির আঘাতে বিদ্ধ হ'য়ে পড়ে গেলেন।

নায়ক নেই—ছত্রভঙ্গ পাঠান সৈন্য চারদিকে পালা'তে লাগল। যদি না পালা'ত তা'হ'লে বোধ হয় মোগলদের এক প্রাণীও রক্ষা পেত না।

কৃত্রিম জল শুকিয়ে উঠ্‌ল। সে আবার এক বিপদ্।

জলাভাব দেখা দিল, একদল মাত্র সৈন্য নিয়ে যা' কিছু যুদ্ধ করছিলেন ঢাকার মোগলদের দারোগা সায়দ মোহম্মদ সাহেব। কিন্তু তিনিও বন্দী হ'লেন; মোগলদের বিপদের সংবাদ শুনে ঢাকা হ'তে কতকগুলি রণ-তরী ও সৈন্য এল বটে কিন্তু তা'দের আসবার আগেই তা'দের থানাদার বন্দী হ'লেন। কোন উপায় রইল না।

তখন মোগলদের দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ ঈশা খাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে সম্মত হ'লেন, দারোগা সায়দ মোহম্মদ ঈশা খাঁর বন্দী ছিলেন, তাঁ'কে দিয়েই ঈশা খাঁর কথা সাহাবাজ খাঁকে ঈশা খাঁ বলা'তে লাগ্‌লেন।

সন্ধির সর্ত্ত হ'ল—মাসুম কাবুলী বঙ্গদেশ ছেড়ে—যুদ্ধ বিগ্রহ ছেড়ে ছুড়ে একেবারে মক্কায় চলে যা'বেন। সোনার গাঁয়ে বাদশার থানাদার থাকবেন। ঈশা খাঁ যথারীতি বাদশাকে খাজনা দিবেন। ঈশা খাঁ সাহাবাজ খাঁর এ সব সর্ত্তেই রাজী হ'লেন, কিন্তু মনের সঙ্গে নয়।

সাহাবাজ খাঁ ঈশা খাঁকে বিশ্বাস না করে সসৈন্যে সেখানে এক বছর তাঁ'র গতি বিধি লক্ষ্য করতে থাকলেন। ঈশা খাঁর মনের কথা অতি অল্প দিনের মধ্যে ফুটে বের হ'ল। তিনি কূটনীতি অবলম্বন করলেন। মোগলদের আমীর দিগকে বড় বড় ভেট্ দিতে লাগলেন। অনেক আমীর সেনাপতি সাহাবাজ খাঁকে ছেড়ে, সোনারগাঁ ছেড়ে চলে

যেতে লাগলেন। তাঁ'দেরে ঘুষ দিয়ে, বাধ্য করে তাড়িয়ে ঈশা খাঁ আবার স্বমূর্ত্তি ধারণ করলেন। সাহাবাজ খাঁ ধূর্ত্তের ধূর্ত্ততা টের পেলেন কিন্তু যুদ্ধ ভিন্ন উপায় কি? যুদ্ধ করবেন কা'দেরে নিয়ে? সকলেই ক্লান্ত, সকলেই বিরক্ত। এদিকে সাহাবাজ খাঁর কড়া শাসনে সকলেই মনে মনে অসন্তুস্ট, যুদ্ধ করলেও তা' সহজে মিট্‌বার নয়, বাংলার বার ভুঁইয়া—তখনও দুরন্ত। দীর্ঘকাল যুদ্ধ করলে যদি কিছু হয়, আমীরেরা বললেন—বারভুঁইয়াদেরে নামে মাত্র সম্রাটের অধীন বলে স্বীকার করা'য়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ক্ কিন্তু সেনাপতি সাহাবাজ খাঁর ইচ্ছা তাঁ'রা সম্রাটের একবারে পদানত হ'য়ে থাকুক্।

মতভেদে আত্মকলহ সুরু হ'ল। মহিব আলি খাঁ ছিলেন সাহাবাজ খাঁর দক্ষিণ হস্ত। তিনি সাহাবাজ খাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন, ক্রমে অধিকাংশ সেনাপতিই তাঁ'র পথ অনুসরণ করলেন, বাকী রইলেন শুধু সেনাপতি কাবুলী খাঁ। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করলেন—সৈন্যেরা তাঁ'র কথা শুনল না। ভাওয়ালে এক যুদ্ধ হ'ল, সেই যুদ্ধে কাবুলী খাঁ আহত হ'লেন। ভাওয়াল ছেড়ে যাওয়া ভিন্ন গতি রইল না।

তিনি চলে গেলে—সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ সকলকে একত্র করবার জন্য শেষ চেষ্টা করলেন, কোন ফল হ'ল

না। একা তিনি কি করবেন? অগত্যা, যুদ্ধের সব ফেলে তিনি প্রাণ নিয়ে তাণ্ডার দিকে পালিয়ে গেলেন। এবার মোগলদের মীর আদনের পুত্রগণ ও অপরাপর বহু সৈন্য বন্দী হ'ল।

মোহম্মদ শা গজনভী বলে যিনি সাহসী সেনা নায়ক ছিলেন তিনি কয়েকজন লোকের সঙ্গে সহসা জলে ডুবে মলেন। জন কয়েক মাত্র সঙ্গী নিয়ে সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ আটদিন পর—সেরপুরে গিয়ে হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচলেন।

তিনি উপায়ান্তর না দেখে বাদশাকে খুলে লিখলেন। বাদশা বহু সৈন্য সঙ্গে দিয়ে তাঁ'র বিচক্ষণ সেনাপতি উজীর খাঁকে পাঠিয়ে দিলেন, দু'জনের চেষ্টায় পাঠানগণ কতকটা শান্ত হ'ল, বাদশা সাহাবাজ খাঁর স্থানে উজীর খাঁকে বাংলার সুবেদার করে সাহাবাজ খাঁকে দেশে ফিরে যেতে আদেশ দিলেন। উজীর খাঁ অল্পদিন বাংলা শাসন করেই পরলোক গমন করলেন। বাংলা দেশ নিয়ে বাদশার বড় চিন্তা হ'ল। তিনি অনেক ভেবে চিন্তে সর্ব্বাপেক্ষা বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা, অম্বরাধিপতি মানসিংহকে বাংলা দেশ শাসন করতে পাঠা'লেন। মানসিংহ যেমন যোদ্ধা, তেমনই রাজভক্ত, তেমনই কূটনীতি বিশারদ ছিলেন।

মানসিংহ সুকৌশলে বিহার ও উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমন করে, এলেন বাংলা দেশে। বাংলা দেশের বারভূঁইয়াদের

যন্ত্রণায় সকলে ছট্‌ফট্‌ করছিলেন। প্রধান শত্রু ছিলেন ঈশা খাঁ আর তাঁ'র সঙ্গী মাসুম কাবুলী। এদের সঙ্গে উড়িষ্যার ও বিহারের বিদ্রোহীদেরও যোগ ছিল।

মানসিংহ ঈশা খাঁর রাজধানী খিজিরপুর অবরোধ করলেন। ঈশা খাঁর দল তখন মহা পরাক্রান্ত। যত সব বিদ্রোহী তাঁ'র দলে। প্রথম যুদ্ধে মানসিংহ ঈশা খাঁর কিছুই করতে পারলেন না, বরং মানসিংহের এক জামাতাই নিহত হ'লেন। কেমন করে নিহত হ'লেন সে এক বড় মজার কথা।

এ হচ্ছে, ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দের কথা, ক্ষত্রির বীর রাজা মানসিংহ ঈশা খাঁর এগারসিন্ধু দুর্গ অবরোধ করলেন। ঈশা খাঁ তখন সেখানে ছিলেন না। দুর্গাবরোধ সংবাদ শুনে তিনি সৈন্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হ'লেন। ঈশা খাঁর সৈন্যগণ তাঁ'র অবাধ্য হ'ল। যুদ্ধ করতে সম্মত হ'ল না, কিন্তু ঈশা খাঁ কাপুরুষ ছিলেন না, তিনি রাজা মানসিংহকে অগত্যা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে বললেন এই যুদ্ধে যিনি জীবিত থাকবেন তিনিই বাংলা একাকী ভোগ করবেন।

রাজা মানসিংহ ঈশা খাঁর এ প্রস্তাবে সম্মত হ'লেন। ঈশা খাঁ ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধস্থলে এসে উপস্থিত হ'লেন, দেখলেন তাঁ'র প্রতিদ্বন্দ্বী একজন তরুণ যুবক, রাজা মান-

সিংহ আসেন নি, এসেছেন তাঁ'র জামাতা। ঈশা খাঁ তাঁ'রই সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। তিনি ঈশা খাঁ'র হাতে নিহত হ'লেন। ঈশা খাঁ রাজা মানসিংকে ভীরু বলে ভর্ৎসনা করে নিজের শিবিরে চলে গেলেন। কিন্তু ঈশা খাঁ শিবিরে প্রবেশ করতে না করতেই সংবাদ এল যে রাজা মানসিংহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। ঈশা খাঁও পশ্চাৎপদ হ'বার লোক ন'ন্। তিনি অশ্বারোহণে, তড়িৎ গতিতে যুদ্ধভূমিতে

উপনীত হ'লেন, এসে বললেন—"যাবৎ তিনি তাঁ'র প্রতি-দ্বন্দ্বীকে রাজা মানসিংহ বলে চিনতে না পারবেন, তাবৎ

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'বেন না। কিন্তু ঈশা খাঁর রাজা মানসিংহকে চিনতে বিলম্ব হ'ল না। প্রথম আক্রমণেই মানসিংহের তরবারি ভেঙ্গে গেল। ঈশা খাঁ আপনার তরবরি রাজাকে দিলেন। কিন্তু রাজা তা' না নিয়ে ঘোড়া হ'তে নেমে পড়লেন। ঈশা খাঁও নামলেন, নিরস্ত্র রাজার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে উদ্যত হ'লেন।

মানসিংহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লেন না, প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশাখাঁর উদারতা, সাহস ও বীরত্বে সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁ'কে বন্ধু বলে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে আপ্যায়িত করে, উপহারাদি দানে সন্তুষ্ট করে বিদায় দিলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক আবার লিখেছেন ঃ—মানসিংহ অনেক দিন ধরে চেষ্টা করেও যখন ঈশা খাঁকে দমন করতে পারলেন না তখন কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিলেন। তিনি ঈশা খাঁকে বুঝা'লেন, "কেন মিছামিছি লোকক্ষয় করছেন—এতে আমিও সুখে নেই—আপনার প্রজাদেরও সুখ নেই, আমরাও হয়রান হচ্ছি। মোগলের শক্তি অফুরন্ত তা'ত আপনি জানেনই—যত দিন বশ্যতা স্বীকার না করবেন, ততদিন আপনার নিস্তার নেই। বাদশার নাম মাত্র অধীনতা স্বীকার করুন্, কেবল বার্ষিক একটা রাজস্ব দেওয়া ছাড়া ত আর কোন অধীনতা নেই, আপনি আপনার রাজ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবেন।" ঈশা খাঁও অনবরত যুদ্ধে বিরক্ত

ও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছিলেন। বিচক্ষণ রাজা মানসিংহের যুক্তি তাঁ'র মন্দ লাগ্‌ল না। তিনি সন্ধি করে, বশ্যতা স্বীকার করলেন! মানসিংহ ঈশা খাঁকে "মস্‌নদ-ই-আলি" অর্থাৎ ঈশ্বরের সিংহাসন উপাধি ভূষণে সম্মানিত করে দিল্লী ফিরে গেলেন।

অন্য একজন বলেছেন ঃ—"ঈশা খাঁ এর পর রাজা মানসিংহের সঙ্গে আগ্রায় সম্রাট্ আকবরের নিকট উপস্থিত হ'লেন। তাঁ'কে কারারুদ্ধ করা হ'ল। শেষে সম্রাট্ যখন তাঁ'র এগারসিন্ধুর দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিবরণ শুনলেন, তখন তাঁ'কে অবিলম্বে কারামুক্ত করে, "দেওয়ান" ও "মসনদ-ই-আলি" উপাধি এবং বাংলার অনেক পরগণার শাসনভার দিয়ে সম্মানিত করলেন। বাইশটি পরগণাও দিয়ে দিয়েছিলেন বলে এই ঐতিহাসিক বলেছেন।"

ঈশা খাঁ আধিপত্য করতেন সুবর্ণগ্রামে সমগ্র পূর্ব্ব বাংলা তাঁ'র অধীন ছিল। তিনি আসামের অন্তর্গত রাঙ্গামাটিতে, নারায়ণগঞ্জের অপর তীরবর্ত্তী ত্রিবেণীতে, যে স্থানে লক্ষ্যা নদী ব্রহ্মপুত্র হ'তে বের হ'য়েছে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী এগারসিন্ধুতে দুর্গ নির্ম্মাণ করেছিলেন। ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ীতেও রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। শেরপুর দশকাহনিয়ায়ও দুর্গ নির্ম্মাণ করেছিলেন।

১৫৮৩ খৃষ্টাব্দের রালফ ফিচ্ নামক একজন প্রসিদ্ধ

ভ্রমণকারীর ভ্রমণবৃত্তান্তে ঈশা খাঁর কথা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন ঃ—"এই সমস্ত দেশের প্রধান রাজার নাম ঈশা খাঁ। তিনি অন্যান্য অভিজাতদিগের মধ্যে প্রধান এবং খৃষ্টানদের পরম বন্ধু।"

ঈশা খাঁ বাঙ্গালী ছিলেন, অথচ তেমন বীরের কথা বাংলার ঐতিহাসিকগণ লিখেন নি। এই বাঙ্গালী বীর জলে স্থলে সমান বিক্রমে মোগল সেনাপতিদের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাঁ'র অসংখ্য রণ-তরী ছিল! পূর্ব্ববঙ্গের বড় বড় নদী ছিল তাঁ'র আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ।

কামরূপ যখন কোচবিহারের অধীন ছিল, ঈশা খাঁ তখন কোচবিহারের রাজাকে জয় করেছিলেন।

ঈশা খাঁ প্রজার সুখ ও স্বচ্ছলতার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করতেন। তিনি রাজ্য মধ্যে বহু খাল ও পুকুর কাটা'য়ে তাঁর রাজ্যময় জলের সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

তাঁ'র রাজত্ব সময়ে সোনারগাঁয়ে টাকায় ৪/ চার মণ চা'ল বিক্রয় হ'ত, শস্য বেশ জন্মা'ত, খাজনাও খুব অল্প ছিল। বিদেশে তিনি দেশের মাল রপ্তানী করতে দিতেন না। কাযেই প্রজার সুখের আর সীমা ছিল না। ঈশা খাঁর জয়-পতাকা সমুদ্র-তট অবধি উড়েছিল। ময়মনসিংহের

অন্তর্গত সুসঙ্গের রাজ্যের সীমা অবধি ঈশা খাঁর রাজ্যের সীমা ছিল।

১৫৯৮ খৃষ্টাব্দের শেষাংশে বা ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে বীরোত্তম ঈশা খাঁর দেহান্তর ঘটে।

তাঁ'র দুই ছেলে ছিলেন। একজনের নাম ছিল মুসা খাঁ ও অন্যটির নাম ছিল মোহম্মদ খাঁ। তাঁ'রা কখনও মোগল বাদশার সঙ্গে শত্রুতা করেন নি। মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি এসে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলী অবরোধ করেন, তখন মুসা খাঁর ছেলে মাসুম খাঁ মোগল জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বাদশার আসাম আক্রমণ কালে তিনি ২৫ খানা কোষা নৌকা দিয়ে বাদশাকে সাহায্য করেছিলেন বলে জানা যায়।

ঈশা খাঁকে বাঙ্গালীর ভুলবার উপায় নেই। তাঁ'র কীর্ত্তিতে বাংলা দেশ ভরে রয়েছে। এখনও তাঁ'র অসীম বীরত্বের নিদর্শন সুদৃঢ়, সুদৃশ্য কামান এখানে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে। বেশী দিনের কথা নয়—এই ৩৭ সাইত্রিশ বছর আগেও একজন কৃষক ক্ষেত চাষ করবার সময় একে একে ঈশা খাঁর সাত সাতটী কামান পেয়েছিল। তখনকার ডিরেক্টার অফ্ পাব্লিক্ ইনষ্ট্রাকসন্ অফ্ বেঙ্গল—এইচ, ই, ষ্টেপলটন্ সাহেব ঐ কামানগুলির সময় নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন, পিত্তল নির্ম্মিত এই কামান গুলিতে লিখা ছিল ১০০২।

উহা কি কামানের নম্বর, না কোন সন বা তারিখ তা' নির্ণয় করা দুরূহ হয়েছে।

কা'রও কা'রও মতে বাংলার ভৌমিকশ্রেষ্ঠ ঈশা খাঁ যাবজ্জীবন মোগলের বশ্যতাই স্বীকার করেন নি। এক জন বাঙ্গালীর পক্ষে—এমন সাহস, এমন দুর্দ্ধর্ষতা—এমন বীরত্ব যে কত গৌরবের, তা' ভাবলেও শরীর পুলকিত হ'য়ে উঠে। বাল্যে যিনি বিক্রীত হ'য়ে ক্রীতদাস রূপে সুদূর তুরাণে বিতাড়িত হয়েছিলেন, তাঁ'র জীবনের শেষাংশের এতাদৃশ মহনীয় বীরত্ব কাহিনী, এতাদৃশ অবদান পরম্পরা কা'র না চিত্তে সম্ভ্রমের উদ্রেক্ করে?

ঈশা খাঁর অনেক কথা বলা হ'ল এবার আর একটি কথা ব'ল্‌ব তা' চাঁদরায় ও কেদাররায়ের গল্পে বলা হয়েছে তাহাই আবার বলিতেছি।

বারভূঁইয়ার অন্যতম দু' ভূঁইয়া ছিলেন চাঁদরায় কেদার রায়, তাঁ'দের কথা আগেই বলেছি, তাঁ'দের রাজধানী ছিল শ্রীপুরে।

ঈশা খাঁর সঙ্গে এঁদের খুব ভাব ছিল, রাজ্যের নানা পরামর্শের জন্য ঈশাখাঁ এলেন—শ্রীপুরে। সেখানে তাঁ'র যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনাও করা হ'ল।

দৈবের নির্ব্বন্ধ! ঈশা খাঁ ছদ্মবেশে শ্রীনগরের শোভা

ও সৌন্দর্য্য দেখতে বের হ'লেন। সঙ্গে সৈন্য সামন্ত কিছু রইল না—চললেন একাকী।

ঈশা খাঁ দেখলেন—শ্রীনগরে কত বড় বড় বাড়ী, বাড়ীতে বাড়ীতে উড়্ছে নিশান—রাস্তায় রাস্তায় গাড়ী, ঘোড়ার অবধি নেই। দেখতে দেখতে এলেন রাজবাড়ীর সামনে। সে কি প্রকাণ্ড অট্টালিকা! মহলের পর তা'র মহল চলেছে, আঙ্গিনার পর তা'র আঙ্গিনা!

তখন সন্ধ্যা কাল! হাজার প্রদীপ জ্বলে উঠ্ল—দেয়ালের গায়ের নক্সায় নক্সায় আলো ঠিকরে পড়্ল। ঈশা খাঁ চেয়ে দেখলেন, ছাদের উপর একটী সুন্দরী মেয়ে বসে আছে। পরণে তাঁ'র শাদা ধব্‌ধবে শাড়ী, চুলগুলো তাঁ'র মেঘের বরণ, কাঁধে, চোখে, মুখে পড়েছে এলিয়ে। মুখখানা যেন পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্য ছেনে কে গড়েছে!

দেখে ঈশা খাঁর চোখের পলক আর পড়ল না—তাঁ'র চোখের মণি যেন আর নড়ল না—এমন মেয়েও আছে? ঈশা খাঁ ভাবলেন, এঁকে যেমন করে হ'ক্ পাওয়াই চাই। খেয়ালই নেই। কিন্তু যে তা' কি করে হ'বে? তিনি যে মোসলমান!

ঈশা খাঁ পাগলের মত হ'য়ে ফিরলেন—সোনারগাঁয়ে—তাঁ'র বাড়ীতে।

অনেক ভেবে চিন্তে তিনি দূত এনায়েৎ খাঁকে দিয়ে চিঠি লিখে পাঠা'লেন চাঁদরায়ের কাছে।

দূত গিয়ে চিঠি দিল। কেদার রায় কৌটা খুলে আতর মাখা সেই চিঠি পড়ে—ক্রোধে অধীর হ'য়ে বললেন, "যাও, তোমার মনিবকে বলো—এ চিঠির উত্তর তরোয়ালের মুখে দেওয়া হ'বে।"

কলাগাছিয়ায় ঈশা খাঁ, চাঁদ-কেদারের কাছে হেরে গেলেন, কেদারের কামানে কলাগাছিয়ার দুর্গ মাটির সঙ্গে মিশে গেল। যেখানে ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও গঙ্গা এসে মিশেছে, সেইখানে ছিল ঈশা খাঁর ত্রিবেণী-দুর্গ। ঈশা খাঁ আশ্রয় নিলেন সেই ত্রিবেণীতে। কেদার রায় তাঁ'র [illegible] শুধু দেড়শ ছিপ নিয়ে নদী বেয়ে চললেন। ছিপের হাজার সৈন্য নিয়ে নিজে কেদার রায় ত্রিবেণীর নিকটে এসে পড়লেন। কিন্তু শ্রীমন্ত ঠাকুর বলে একজন ষড়যন্ত্রকারী ব্রাহ্মণের চেষ্টায় চাঁদরায়ের মেয়ে স্বর্ণময়ী বা সোনামণি যাঁ'কে দেখে ঈশা খাঁ পাগল হয়েছিলেন, তিনি ঈশা খাঁর হস্তগতা হ'লেন। এই অপমানে রাজা চাঁদরায় জীবন ত্যাগ করলেন।

তা'র পর—দিন গেল—মাস গেল—স্বর্ণময়ী ঈশা খাঁ সাহেবের অঙ্কলক্ষ্মী হ'লেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ঈশা খাঁ মরে গেলে, মোগলেরা নাকি, সোনারগাঁ আক্রমণ করেছিলেন,
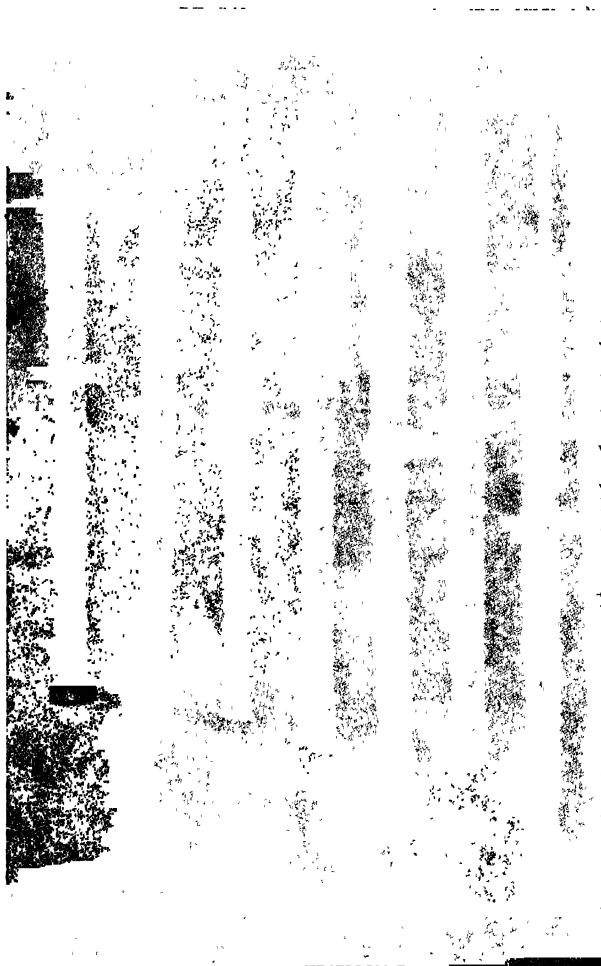
ঈশাখাঁর কামান।

দশ দিন দশ রাত্রি ঈশা খাঁর বেগম স্বর্ণময়ী বা সোনাবিবি সোনারগাঁকে মোগলের হাত হ'তে রক্ষা করে অবশেষে চিতা জ্বেলে পুড়ে মরেছিলেন।

ঈশা খাঁর জীবনে এটী কু কি সু কায তা'র বিচার করবার অবসর আমাদের নেই—দরকারও নেই।

আমরা শুধু ভাবি, যদি এ ঘটনা না ঘট্‌ত, তা'হলে চাঁদরায় ও কেদার রায়ের সঙ্গে ঈশা খাঁর সম্মেলনে যে অদ্ভুত শক্তির উদ্ভব হ'ত, তা'তে হয়ত আমাদের মাতৃভূমি বাংলা দেশের রূপ অন্য আকার ধারণ করত।

—একাদশ অধ্যায়—

"তাঁ'দের গরিমা-স্মৃতির বর্ম্মে,
চ'লে যা'ব শির করিয়া উচ্চ
যা'দের গরিমাময় এ অতীত
তাঁ'রা কখনই নহে মা তুচ্ছ।

*　　　　*　　　　*

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া
অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগাইব নূতন ভাবের রাজ্য
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল

—পীতাম্বর রায়—

সে অনেক দিনের কথা। রাজসাহী বিভাগে পুঁটিয়া তখন একখানি সামান্য গ্রাম। সেখানে কোথা হ'তে এসে বাস করতে লাগলেন একজন পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। মুনি ঋষির মত তিনি দিন কাটান্। কোন রকম ভোগ বিলাসে তাঁ'র মোটেই আসক্তি নেই। একেবারে সাত্ত্বিক, সাধু ব্রাহ্মণ। একটা কুড়ে তুলে তা'তে একটা আশ্রম

গড়ে তিনি রাত দিন ভগবানের পূজায়—ভগবানের ধ্যানে ডুবে থাকতেন।

ঠাকুরটীর নাম বৎসরাচার্য্য। ঋষি তিনি—সিদ্ধপুরুষ তিনি, সুতরাং তাঁ'র মহিমা অল্পাধিক সকলেই জানতেন। নানাভাবে, কখনও বা উপদেশ, কখনও বা তাবিজ, কবচ দিয়ে তিনি লোকের উপকার করতেন। যা'কে যা' বলতেন, তা' ফলে যেত, সকলেই তাঁ'কে মান্য করতেন, অত্যন্ত ভক্তির চক্ষে দেখতেন।

মুর্শীদাবাদের নবাবগণ তখন ছিলেন দেশের মালীক। তাঁ'দেরই একজন কর্ম্মচারী জায়গীর স্বরূপ একখানি পরগণা প্রাপ্ত হন। কর্ম্মচারীটীর নাম ছিল লস্কর খাঁ। লস্কর খাঁ তাঁ'র জায়গীরের জায়গার নাম রেখেছিলেন লস্করপুর।

তাঁ'র মৃত্যু হ'ল, সুতরাং লস্করপুর পরগণা বাজেয়াপ্ত হ'য়ে গেল।

এদিকে বাংলাদেশের যাঁ'রা খাজনা দিতেন, তাঁ'রা খাজনা বন্ধ করলেন। নবাবের বড় রাগ হ'ল। তিনি একজন মোসলমান সেনাপতিকে মোগলসৈন্য সহ এই বিদ্রোহীদের দমনের জন্য পাঠা'লেন। সেই সেনাপতি এলেন লস্করপুরে। এসে শুনলেন পুঁটিয়ায় এক সাধু আছেন, তাঁ'র অনেক কিছু ক্ষমতা। যাঁ'কে যা' বলেন তা'ই ফলে যায়।

মোসলমান হ'লে কি হ'বে ? সেই সেনাপতি সাহেব বৎসরাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হ'লেন। বিদেশ—বিভূম কিসে কি হয় বলা যায় না—একজন সাধু যদি পিছনে থাকেন হয়ত তিনি দুর্দ্দৈবের হাত থেকে অনেকটা রক্ষা পা'বেন, এই তাঁ'র ধারণা। যত সব বিদ্রোহীদেরে নিয়ে ত খেলা !

বৎসরাচার্য্য সেনাপতির সব কথা শুনলেন। তাঁ'র অভীষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করলেন, ফলে তিনি সর্ব্ববিষয়ে আশাতীত সাফল্য লাভ করে আচার্য্যদেবকে পদ্মানদীর তীরবর্ত্তী সেই লস্কর খাঁর লস্করপুর পরগণাই প্রণামী দান করলেন।

কিন্তু বৎসরাচার্য্য ঠাকুরের বিষয় বাসনা ছিল না। তিনি জমিদারী দেখবেন কি ?

এদিকে, ঠাকুর ছিলেন গৃহী। স্ত্রী-পুত্র ছিল। পুত্রও অনেক ক'জন কিন্তু তাঁ'দের মধ্যে চতুর্থ পুত্র পীতাম্বর ও পঞ্চম পুত্র নীলাম্বরই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

পুত্রদের মধ্যে পীতাম্বর রায় অত্যন্ত চতুর ছিলেন। নানা কৌশলে সেনাপতি, নবাবও অবশেষে সম্রাটের অনুগ্রহ ভাজন হ'য়ে উঠেন। সম্রাট্ তাঁ'কে "রায়" উপাধি ভূষণে ভূষিত করে তাঁ'র পৈতৃক সম্পত্তি লস্করপুর তাঁ'কে উপহার দান করেন। সম্রাটের সহায়তায় পীতাম্বর রায় মহাশয় ক্রমে বড় জমিদার হ'য়ে উঠেন। পীতাম্বর রায় মহাশয় কিছুদিন

জমিদারী পরিচালনা করে মৃত্যুমুখে নিপতিত হন, তা'রপর তাঁ'র ভ্রাতা নীলাম্বর রায় জমিদারীর অনেক কিছু উন্নতি করেন, তাঁ'র বিন্দুমাত্র অহঙ্কার ছিল না, প্রজারা তাঁ'কে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত।

অনন্তর নীলাম্বর রায় মহাশয়ের অভাব হ'লে তাঁ'র পুত্র আনন্দচন্দ্র রায় দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক রাজা উপাধি লাভ করেন ক্রমে রতিকান্ত, রামচন্দ্র, নরনারায়ণ, দর্পনারায়ণ, জয়নারায়ণ, রাজেন্দ্রনারায়ণ ও যোগেন্দ্রনারায়ণ রাজা হন। এই রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রীই ছিলেন রাণী শরৎসুন্দরী ও তাঁ'র পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি দত্তকগ্রহণ করেন। সেই দত্তক পুত্র ও তাঁ'র পত্নী রাণী হেমন্তকুমারী দেবীকে রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন।

—দ্বাদশ অধ্যায়—

—রাজা প্রাণনাথ রায়—

"পথিক সুজন,
নেহারিয়া তাঁ'র কীর্ত্তি—ভক্তিপ্লুত মনে
সম্ভ্রমে নোয়ায় শির। হৃদয়-গগনে
ভাসে তাঁ'র কত ছবি, কত পুণ্য কথা—
কত বরষের হায়, কত শত ব্যথা!"—

—এমদাদ আলি

উত্তর-রাঢ়ী কুলীন কায়স্থ স্বর্গীয় দেবকীনন্দন ঘোষ ছিলেন রংপুর জেলার অতি পুরাতন জমিদার বর্দ্ধনকুঠীর বারেন্দ্র কায়স্থ রাজাদের কর্ম্মচারী। তাঁ'র হরিরাম বলে ছিলেন এক পুত্র। এই হরিরাম ঘোষ মহাশয়েরই আর একটী নাম ছিল—দিনরাজ ঘোষ। অনেক দিন তিনি বেশ প্রতিপত্তির সহিত নবাবী করলেন। তা'রপর তাঁ'র সময় ফুরিয়ে এল—তিনি কালের কোলে ঢলে পড়লেন। তাঁ'র ছেলে শুকদেব রায় হ'লেন নবাব। কিন্তু তাঁ'র নিশ্চিন্তে নবাবী করার ভাগ্য ছিল না। এক মস্ত বড় শত্রু জুট্‌ল। কোচবিহারের রাজা হ'য়ে উঠ্‌লেন দুর্দ্দান্ত।

তিনি এসে বারবার তাঁ'কে জ্বালা'তে সুরু করলেন—তাঁ'র রাজ্যে লুঠ্তরাজ করে তাঁ'কে একেবারে পথে বসা'বার উপক্রম করে তুললেন—আগুন দিয়ে পোড়ায়ে—সব কেড়ে নিয়ে তাঁ'কে একেবারে কষ্টের চূড়ান্ত-সীমায় ফেললেন। নবাব শুকদেব রায়ের মৃত্যু হ'লে তাঁ'র ভাগ্যবান্ পুত্র প্রাণনাথ রায় পিতৃপরিত্যক্ত সেই সামান্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'লেন। তখন ঘনঘটা কেটে গেছে—চারদিকে ফুটে উঠেছে জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্না নয়—বুঝি দিনের আলো।

প্রাণনাথ রায় মহাশয় যখন নবাবী গ্রহণ করলেন তখন তিনি চারদিক লক্ষ্য করে দেখলেন যে নিজে বিশেষ চেষ্টা না করলে কিছু হ'বার উপায় নেই—মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে নিজেই কা'রও কোন সনদ টনদ না নিয়েই নবাব হ'য়ে দাঁড়া'লেন। কোচবিহারের রাজা তাঁ'র বাবাকে যে নির্য্যাতন করতেন সে সব' তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন, উপায় ছিল না বলে বহু কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করে থাকতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। নবাব হ'য়ে তাঁ'র সকলের আগে চেষ্টা হ'ল এই রাজাকে শায়েস্তা করা। তিনি নানা চেষ্টা করে, অনেক সৈন্য বা'ড়া'লেন। বেশ করে তা'দেরে শিখা'লেন যুদ্ধ। তা'রপর যুদ্ধ করে, কোচবিহারের রাজাকে পরাস্ত করে বৈরনির্য্যাতন করলেন। তাঁ'র পৈতৃক রাজ্যের

উত্তরাংশটা কোচবিহারের রাজা দখল করেছিলেন, তিনি তা' আবার কেড়ে নিলেন। মোগল ও উজ্‌বগস র্দারদেরে বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী করে তা'দের হাত থেকে নিয়ে নিলেন—তা'দের যত সব জাইগীর। কতক তাঁ'র পিতার সনদের বলে আর কতক বলপূর্ব্বক নিজের অধিকার ভুক্ত করলেন। পিতার সময় যা' রাজ্য ছিল তাঁ'র সময়ে তা'র চেয়ে ঢের বেড়ে গেল। দিনাজপুর জেলার সবটা হ'ল তাঁ'র নিজের, তা'রপর রংপুর, বগুড়া, রাজসাহী, মাল্‌দ, পূর্ণিয়া এই—পাঁচটা জেলার অনেকাংশ তাঁ'র অধিকারভুক্ত হ'ল। ক্রমে তাঁ'র আয় হ'য়ে দাঁড়া'ল নয় লাখ টাকা। "নবলক্ষের রাজা" বলে তাঁ'র বিশেষ খ্যাতি জন্মিল।

তাঁ'র সময়ে, সব জিনিষ ছিল শস্তা। তাঁ'র রাজত্বের চতুঃপার্শ্বের মধ্যে কোচবিহারের রাজার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু কোচবিহারের রাজার আয় ছিল মোটেই তিন লাখ—আর রাজা প্রাণনাথ নিজের চেষ্টায় আয় করেছিলেন নয় লাখ। এতেই বেশ অনুমান করা যেতে পারে যে তাঁ'র মত বড় রাজা আর তখন কেউ-ই ছিলেন না। যে জায়গায় তিনি যুদ্ধ করে কোচবিহারের রাজাকে পরাজয় করেন সেই জায়গায় তিনি গড়ে উঠান তাঁ'র রাজধানী। তিনি তাঁ'র এই নতুন রাজধানীর নাম দেন—

বিজয় নগর। কিন্তু "বিজয় নগর" নাম দিলে কি হ'বে? দিনাজপুরের নবাব বা রাজার রাজধানী বলে ঐ স্থানটীকে সকলেই বিজয়নগর না বলে বলতে লাগ্‌ল দিনাজপুর। রাজা প্রাণনাথ রায়ের প্রতিষ্ঠিত সেই রাজধানীই আধুনিক দিনাজপুর সহর। পুরাতন দিনাজপুর যেখানে ছিল তা'ত আগেই বলেছি—সে ছিল কান্তনগরের নিকটে।

পরাস্ত হ'য়েও কোচদের রাজা ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। রাতদিন রাজা প্রাণনাথের রাজ্যে নানা উপদ্রব করতেই থাক্‌লেন। রাজা প্রাণনাথ কি করবেন?—বাধ্য হ'য়ে বহু সৈন্য রেখে অতি সতর্কতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। রাজ্য-রক্ষার জন্যই অবশ্য সৈন্য রাখ্‌তে হ'ল—কিন্তু তা'তে বেড়ে গেল তাঁ'র অনেক ব্যয়।

আকবর বাদশার সেনাপতি রাজা মানসিংহ এলেন উদ্ধত কোচ রাজাকে শাসন করতে। তাঁ'র পক্ষ নিলেন নবাব বা রাজা প্রাণনাথ রায়। ঠাকুর ভানুসিংহের ও রাজা মানসিংহের সমস্ত রসদ যোগিয়েছিলেন এই রাজা প্রাণনাথ রায়—তা' ছাড়া সৈন্য দিয়েও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ অগত্যা মানসিংহের সঙ্গে সন্ধি করেন। ফলটা বড় মন্দ হ'ল না। রাজা মানসিংহ তাঁ'দের জিগীষার নিবৃত্তির জন্য

এক চমৎকার উপায় করলেন। রাজা প্রাণনাথকে বলে তাঁ'র করদ রাজা বলে ঘোষণা করে দিলেন আর কোচ-বিহারের রাজার সঙ্গে পাগড়ী বদল করিয়ে বন্ধুত্ব করা'লেন। এতদিনকার এত ঝঞ্ঝাট্ এইভাবে খানিকটা মিটে গেল। এখনও চলে আস্‌ছে এ বন্ধুতা। এই আপোষ-মীমাংসার পর রাজা প্রাণনাথের তেমন আর কোন উদ্বেগজনক শত্রু রইল না। রাজ্য নিষ্কণ্টক হওয়ায়—শান্তি দেখা দিল। প্রজারা হ'য়ে উঠ্‌ল সুখী। রাজা প্রাণনাথও এই শুভ অবসরে রাজার যে সব কায সেই সব আরম্ভ করে দিলেন। আয় বেশ ছিল—তিনি করতে লাগ্‌লেন মুক্তহস্তে দান। রাজ্যময় জলের অভাব যেখানেই সুবিধা পেলেন—জলাশয় খনন করিয়ে দিলেন, প্রজাদের মধ্যে ধর্ম্ম-ভাব বৃদ্ধির জন্য নানা দেবদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে—দেব-মন্দির গড়ে, নানা ধর্ম্মোৎসব করা'য়ে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করলেন। সৎকর্ম্মে অজস্র অর্থ ব্যয় করেও তাঁ'র কোষাগারে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত হ'তে থাকৃল।

রাজা প্রাণনাথ রায়ই তখনকার দিনে—সে অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথম, ভূমিতে বংশানুক্রমিক স্বত্ববান্ রাজা বলে সনদ পেয়েছিলেন। তাঁ'র পিতা বা পিতামহ ছিলেন কেবল নবাব, অর্থাৎ অস্থায়ী প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তা। রাজারা ছিলেন ভূমিতে স্বত্ববান্ মালীক আর নবাবেরা

ছিলেন, বেতনভোগী অস্থায়ী চাকর। এজন্য নবাবদের চেয়ে রাজাদের সম্মান ছিল বেশী। মোগল সাম্রাজ্যের শেষভাগে নবাবেরা প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁ'দের নবাব উপাধি তেমনই ছিল। তখন অনেক রাজ্য নবাবদের অধীন থাকায় নবাব উপার্ধি হ'য়ে উঠেছিল রাজা উপাধিরও চেয়ে উঁচু। বহুব্যয়ে সর্ব্বমনোরম এক মন্দিরে তিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। এই মন্দির—রাজা প্রাণনাথ রায় মহাশয়ের বংশের একটী মহাকীর্ত্তি এবং বাঙ্গালী শিল্পের একটী পরমোৎ- কৃষ্ট নিদর্শন।

সমাপ্ত